জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩৪ তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২৩৪তম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

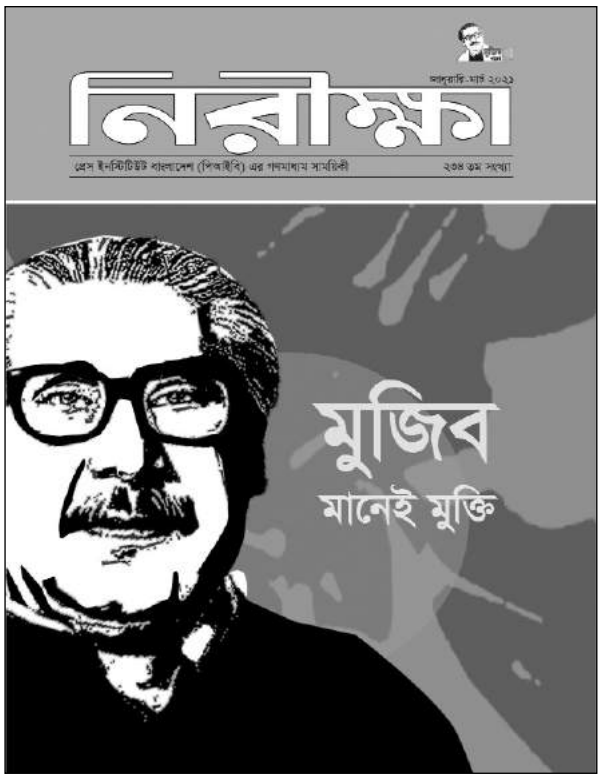

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের অস্তিত্বের অংশ। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তাঁর আত্মত্যাগ ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে। তিনি আমাদের একটি স্বাধীন ভূখণ্ড দিয়েছেন এবং বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর দেখানো পথেই দেশ আজ এগিয়ে চলছে। সেই পথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার কাজে খুব বেশি সময় পাননি। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির মদতে কিছু বিশ্বাসঘাতক তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এরপর জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্বাধীনতার অর্জনগুলো রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। দেশকে আবার বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত পথে এগিয়ে নিতে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন। তাঁর সেই চেষ্টা সফল হচ্ছে। নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে।

ক্ষণজন্মা এই মানুষটির মহাজীবন শতবর্ষেও অবিনশ্বর, অম্লান। ইতিহাসের পরতে পরতে তিনি আছেন অমলিন স্মৃতিতে। নিজেই বলেছিলেন, 'আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু। আমি তো আমার জীবন জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছি।' সেটাই তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। সহজ করে বললে, আমরা যে মুক্ত আকাশের নিচে বাস করছি, সেই আকাশটা শেখ মুজিবের। তিনিই বাঙালির জাতির পিতা। আমাদের নেতা। আমাদের আদর্শ। আমাদের চেতনা। শতবর্ষে বাঙালি জাতির অনুপ্রেরণা। তিনি বাংলার মানুষের হৃদয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুহীন, চিরভাস্বর। তিনিই আমাদের মহানায়ক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলব, 'তুমি ঘুমাও পিতা শান্তিতে। তোমার বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমরা জেগে রইব তোমার আদর্শ বুকে নিয়ে।' শুভ জন্মদিন জাতির পিতা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

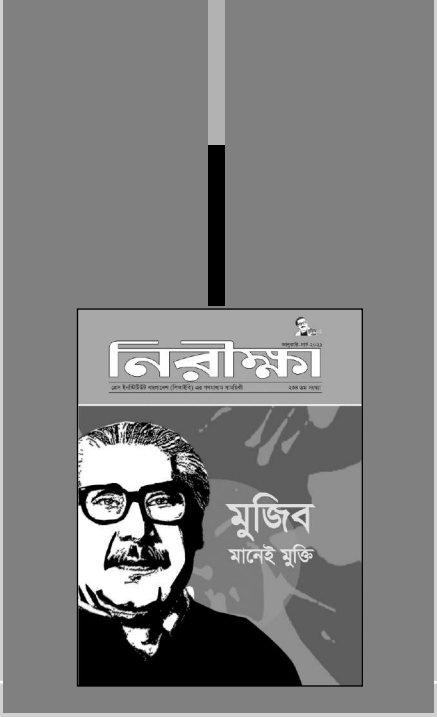

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী ৩
শেখ হাসিনা

বাবা ৭
শেখ রেহানা

সাংবাদিক শেখ মুজিব ৮
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ ১১
আবেদ খান

বঙ্গবন্ধু ও পাকিস্তানের রাজনীতিকে অর্থনীতির ধারায় ফেরানো ১৫
স্বদেশ রায়

বঙ্গবন্ধু বললেন বাঙালির জন্য আলাদা শাসনব্যবস্থা দরকার ১৮
— মাহফুজা খানম

বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব ২৫
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

২৮ মহানায়ক হয়ে ওঠার মহাকাব্য
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

৩৩ তাঁকে দাবায়ে রাখা যায়নি
অজয় দাশগুপ্ত

৩৯ বঙ্গবন্ধু ১৯৭১: জানুয়ারি থেকে মার্চের জন্ম-জয়রথে
রেজা সেলিম

৪৪ পিতা মুজিব এবং তাঁর সংগ্রাম
সরদার সিরাজুল ইসলাম

৪৭ স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতার জন্মদিন ॥ সংবাদপত্রে প্রতিফলন
পপি দেবী থাপা

৫৩ জন্ম যদি তব বঙ্গে
জাফর ওয়াজেদ

৫৭ গণমাধ্যম সংবাদ

৬৪ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী

শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের প্রতিটি মানুষের অতি আপনজন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, সম্প্রদায়–নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্যই ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য তাঁর স্নেহ ও দায়িত্ব কিছু কম ছিল না। যারা সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। এই অশুভ শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনী নিয়ে একটা বিতর্কের সূত্রপাত করা। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্য বা জনগণ কেউই তা চায় না। এতে শুধু সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় না, জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাও বেড়ে যায়। সেনাবাহিনী নিয়ে যে কোনো ধরনের বিতর্কই দেশের জন্যও হয় আত্মঘাতী। জনগণের সঙ্গে একাত্মতাবোধ নষ্ট হলে তাদের ওপর অর্পিত দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন বিঘ্নিত হয়। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণের সহজ শিকারে পরিণত হয়। কোনো দেশপ্রেমিক সুস্থ মানুষই এ রকম অবস্থা কামনা করতে পারে না।

পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনী জনসাধারণের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিল। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব প্রস্তুতি ও জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে নস্যাৎ করে ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসেছিল। গভীর রাতে ক্ষমতার হাতবদল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চরিত্রকে করে তুলেছিল কলঙ্কিত। বেলুচিস্তানে বোমা ফেলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অধিকারহরণ করে সেনাবাহিনী চূড়ান্তভাবে জনগণের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিল। সংঘাত ছিল যার স্বাভাবিক পরিণতি। আজ পর্যন্ত পাকিস্তানে সেই সংঘাতের অবসান ঘটেনি।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই বাংলাদেশ পাকিস্তানি শাসক-শোষকচক্রের বাজারে পরিণত হয়ে একটি নয়া উপনিবেশ হিসাবে গড়ে উঠল। তবে এ অবস্থা প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। আর এর থেকে শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী গণসংগ্রামের। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলাবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের ছয় দফা, ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশের অভিযাত্রায় একেকটি পতাকাচিহ্ন। এসব আন্দোলন আর সংগ্রামের স্তরে স্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ঘটে উত্তরণ। ১৯৭১-এ এসে তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর বাঙালি জনতা একীভূত হয়ে যায়।

> প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী জন্মলগ্নেই সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ আন্তরিকতা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনী

আমাদের ইতিহাসের এ পর্যায়ক্রমিক ধাপে অন্যান্য দাবির পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও বেসামরিক চাকরিতে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তি, পদোন্নতি ইত্যাদি প্রশ্নে যে বৈষম্যমূলক নীতি বিরাজ করছিল, এর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু প্রথম থেকেই ছিলেন সোচ্চার। আর এ কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিতে পূর্ব বাংলার জন্য স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী এবং নৌ সদর পূর্ব বাংলায় স্থাপনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। বাঙালির সেদিনের সংগ্রাম ও আন্দোলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সমগ্র জাতির মতোই তাঁর সেই আবেদন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিল অভূতপূর্ব। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি ১৯৭১-এর রক্তে বান ডাকানো দিনগুলোতে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের ওপর। সে মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২নং ধানমন্ডি সড়কের বাড়ি থেকে ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। তিনি ডাক দিলেন সব বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে। শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধ। চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও যুদ্ধের আহ্বান ওয়্যারলেসযোগে পৌঁছে দেওয়া হলো। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনতা ও অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জওয়ান ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে এলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জওয়ান ভাইয়েরা। আর এভাবেই সূচনা হলো একটি নতুন দেশ এবং একটি নতুন সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টির। বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও নিজেদের দেশপ্রেমের জন্যই একটি শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে গড়ে উঠতে পেরেছে আমাদের সেনাবাহিনী। বিজয়ী সৈনিকের উপযোগী স্বাধীন দেশের বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তাই বঙ্গবন্ধু এবং এদেশের জনগণ স্বাধীনতার পর সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীকে আর সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত করার জন্য জনসাধারণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সংকুচিত করতে হয়েছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অনেক জরুরি কর্মসূচি। তবুও সেনাবাহিনীর চাহিদা মেটাতে কুণ্ঠিত হয়নি বাংলার মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিলেন যেমন স্নেহপ্রবণ, তেমনই দায়িত্বসচেতন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তখন হাজারো সমস্যা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পিছু হটার সময় রাস্তাঘাট, রেলসতু, ব্রিজ, কালভার্ট–সব ভেঙে দিয়ে গেছে। অকেজো করে দিয়েছে বন্দর। জ্বালিয়ে ফেলেছে অনেক শহর, গ্রাম। দেশের কলকারখানা প্রায় সবই ছিল বিধ্বস্ত। কৃষিকাজও তখন প্রায় বন্ধ। এর ওপর এক কোটি শরণার্থীর সমস্যা। যুদ্ধে নিহত, আহত, ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ পরিবার। ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে মুক্তি পাওয়া সদ্যস্বাধীন একটি দেশের সম্পদ বলতে তখন শুধু মানুষের ঐক্য ও কর্মস্পৃহা। এরকম অবস্থায় বঙ্গবন্ধু হাত দেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে। কিন্তু তাতেও সেনাবাহিনীর চাহিদা এতটুকু খাটো করে দেখেননি তিনি। সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার। ইনফ্যানট্রি, আর্টিলারি, সিগন্যাল, আর্মড, ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়ন এবং আনুষঙ্গিক ইউনিটসহ তিনি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী জন্মলগ্নেই সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ আন্তরিকতা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনী।

দেশ তখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। বঙ্গবন্ধু হাঁপিয়ে উঠেছেন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে। বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও তখন তুঙ্গে। সেই সংকটের সময়ও বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনীর কথা। খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভার। যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পদাতিক বাহিনীর জন্য আনা হয় ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র। ভারতের অনুদান ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহণ বিমান। সেসময়ে মিগ-২১ই ছিল এই উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক বিমান। আজ পর্যন্ত এর সমকক্ষ কোনো জঙ্গিবিমান আওয়ামী লীগ-পরবর্তী সরকারগুলোর পক্ষে সামরিক বাহিনীর জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেই মিসর থেকে আনা সম্ভব হয়েছে সাঁজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক। উন্নত প্রযুক্তি

ও উন্নত জ্ঞানলাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে, সে উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠান। ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেনাবাহিনীর অফিসাররা। জেনারেল এরশাদ নিজেও সেসময় দিল্লিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করে এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলেন। এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর প্রতি কোনো প্রকার অনীহা প্রকাশ করেননি। তিনি সামরিক একাডেমি স্থাপন করে আরও নতুন নতুন তেজোদীপ্ত তরুণের সমন্বয়ে সেনাবাহিনীকে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন।

পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী আরও ৩০ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। এ কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তৎকালীন সেনাবাহিনীর অনেক কর্তাব্যক্তি এই পুনর্বাসনের বিরোধিতা করেছেন। অনেক জেনারেল বিভিন্ন সেনাছাউনিতে গিয়ে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বক্তৃতাও করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত উদার ও যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকারী হাজার হাজার সৈনিক ছিল দেশেরই সন্তান। তাঁরা দেশের শত্রু ছিল না। জাতির পিতা হিসাবে তাঁদের প্রতি অনুদার ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তাছাড়া সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজনও ছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করাই বঙ্গবন্ধু যুক্তিসংগত মনে করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তখন ৩০-৪০ জন মাত্র কর্মকর্তা। আর প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় তেরো শ। বঙ্গবন্ধু সেদিন অত্যন্ত সততার সঙ্গে সব অফিসার ও জওয়ানকে নিয়ে অর্ধলক্ষের অধিক সদস্যের সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

বঙ্গবন্ধু সবাইকে শুধু চাকরিতে পুনর্বাসনই করেননি, কর্মকর্তা ও সদস্যদের জন্য নির্ধারণ করেছেন পদোন্নতির প্রণালি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেছেন। আজকের কর্মকর্তা ও সেনানায়কদের পদমর্যাদা লক্ষ করলেই এর সত্যতা মিলবে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তা ও জওয়ানদের পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালীন বেতন প্রদান করেন। সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহের জন্যই শুধু বঙ্গবন্ধু ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, সেনাছাউনির (ক্যান্টনমেন্ট) উন্নতি ও নতুন ছাউনি নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয় তখনই। পুরোনো ছাউনিগুলোয় নতুন নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার সঙ্গে নতুন ছাউনিও গড়ে ওঠে সারাদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'দীঘিনালা', 'রুমা', 'আলীকদম'-এর মতো সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ছাউনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই গড়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারই প্রথম সেনাবাহিনীর সদস্যদের ওপর যারা নির্ভরশীল, তাদের রেশন নিকটস্থ সেনাছাউনি থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে যারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ছাউনিতে অবস্থান করতেন, তারাই শুধু এ সুযোগ লাভ করতেন।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফল। অথচ এ নিয়েও একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রচারের ঘোলা জলে মাছ শিকারে নেমেছিল। জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনোদিনই সামরিক বাহিনীর বিকল্প ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেরও প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির মধ্যেই বাঙালির সামরিক স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে জনগণের কল্যাণের জন্যই বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের সহায়ক শক্তিরূপে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেন–যার সদস্যসংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেরত দেওয়া অস্ত্রেই শুধু তারা সজ্জিত ছিল। কোনো ব্যাটালিয়ানেই ছয় থেকে সাতটার বেশি হালকা মেশিনগান ছাড়া ভারী অস্ত্র ছিল না। প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এবং সর্বোপরি সদ্যস্বাধীন দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ধরনের বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা সারাবিশ্বে বিদ্যমান। সেভাবেই বঙ্গবন্ধুও গঠন করেছিলেন জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনী গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ের মধ্যে, যখন দেশ স্বাধীনতার ধকল সামলে উঠতেই হিমশিম খাচ্ছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজই ছিল তখন জরুরি। এর মধ্যেও সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাহত হতে দেননি বঙ্গবন্ধু, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছেন।

এদেশের সেনাবাহিনী তাই গড়ে উঠেছে জনসাধারণের স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে, বঙ্গবন্ধুর গর্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসাবে। সেই সেনাবাহিনী নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠবে–এ কথা কল্পনা করাও ছিল কঠিন, তা-ই সত্য হয়েছে বাংলাদেশে।

জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী উচ্চাভিলাষী অফিসারের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং এই কুচক্রীরা জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচিকে বানচাল করে বাংলাদেশে প্রগতির ধারা পালটে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে। একের পর এক নিজেদের ক্ষমতারোহণ, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, দুর্নীতি প্রভৃতি সেনাবাহিনীকে অভ্যুত্থানকারীরা তাদের স্থায়ী বাহনে পরিণত করে চলেছে। এমনকি ক্ষমতালোভীরা সেনাবাহিনীর নামে হুমকি দিচ্ছে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করে তাদের বারবার যুক্ত করা হয়েছে সুবিধাবাদী, সমাজবিরোধী ও অসৎ চরিত্রের ক্ষমতাশ্রয়ী সংগঠনের সঙ্গে।

ক্ষমতাসীনরা উসকে দিয়েছে রাজনৈতিক সংগঠনে কলহ-বিভেদ। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ঠেলে দিয়ে নেতাকর্মীদের চরিত্রহননের অশুভ প্রক্রিয়ার সূচনাও করেছে দেশে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতার লোভে অভ্যুত্থানকারী ও তাদের দোসররা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে জনগণের প্রতিপক্ষরূপে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এদেশে সূচনা করা হয়েছে হত্যার রাজনীতি। অন্যায়ভাবে অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাজনীতিতে আগত দুশ্চরিত্র কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগির এক অশুভ প্রক্রিয়া চলেছে। পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের ধারাও এক্ষেত্রে অব্যাহত ছিল। ক্ষমতার লড়াইয়ে একেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে যেমন প্রাণ দিতে হয়েছে বীর সৈনিকদের, তেমনই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে এক দশকে শহিদ হয়েছেন বহু ছাত্র-জননেতা।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের অবস্থাও হয়েছিল আরও সংকটাপন্ন। সামরিক শাসন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি জনজীবনকে যেমন অস্থির করে তুলেছিল; তেমনই নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু-কিশোর হত্যা, খুন, ডাকাতি, ব্যাংকের

টাকা লুট, ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি, সরকারি অর্থ অপব্যয় বেড়ে চলেছিল। বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, বৈদেশিক নীতি, সর্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচি বিসর্জন দিয়ে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য। ক্ষমতাসীনরা সামরিক বাহিনীর নাম ভাঙিয়ে সামরিক শাসনের জাঁতাকলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল নির্যাতনের মুখে।

অথচ বঙ্গবন্ধুর কত গর্বই না ছিল এই সেনাবাহিনী নিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ছিল তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপ। কুমিল্লার সামরিক একাডেমিতে প্রথম সমাপন অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি পূর্ণ সুযোগ পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোনো দেশের যে কোনো সৈনিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে, তাদের সে শক্তি আছে।' তিনি সেদিন তাদের প্রতি শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব কী নির্মম! জাতির পিতার হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত তাঁরই প্রিয় সেনাবাহিনী! কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র সেনাবাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। অথচ ১৫ আগস্টের হত্যার দায়িত্বের বোঝা তাদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে। ক্ষমতাসীনচক্র খুনিদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হয়নি বলেই এই দায় সেনাবাহিনীর কাঁধে চেপে ছিল। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার কারণেও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বাঞ্ছনীয় ছিল। আসলে ক্ষমতাসীনরা সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের কারণেই খুনিদের বিচার করতে চায়নি। সেনাবাহিনীর ওপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এসব ক্ষমতালোভী সেনানায়করা কথার চমক দিয়ে সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশীদারত্বের প্রশ্ন তুলেছে এই বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য। সংবিধানে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। দেশরক্ষা, দেশের উন্নয়ন, দুর্যোগকালে সহায়তা–এসব ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনীর দায়িত্ব রয়েছে। সঙ্গীন নয়, সহৃদয়তাই স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের মাপকাঠি। অথচ উচ্চাভিলাষীরা সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক সেতু ভেঙে জনগণ ও সৈনিকদের মধ্যে প্রতিপক্ষ চেতনার স্থায়ী সংঘর্ষ বাধিয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে চেয়েছিল। ১৫ আগস্টের পর যেমন জনগণ হারিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার, দেশে বৃদ্ধি পেয়েছিল সংকট–ঠিক তেমনই সেনাবাহিনীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাদের করে তোলা হয়েছিল বিতর্কিত। এই অবস্থা দেশের জন্য কিছুতেই কল্যাণকর হয়নি।

সেনাবাহিনী জনগণের পবিত্র আমানত। তারা দেশরক্ষা করবে, দেশ শাসন করা তাদের দায়িত্ব নয়। আমি স্পষ্টই মনে করি, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সৈনিকদের নৈতিক উন্নতি ব্যাহত করে এবং দেশবাসীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে দেশে সামরিক শাসন স্থায়ী করার যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, তাতে সর্বনাশের পথই সুগম হয়। ক্ষমতার স্বার্থে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এ কাজ কারও জন্যই শুভ হয়নি। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার অত্যন্ত কষ্টকর সময়ে দেশবাসীর অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে এই সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র অর্জনের সপক্ষে। সামরিক ও বেসামরিক যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ব্যক্তিস্বার্থে জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর সংগঠন আওয়ামী লীগ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুহৃদ সহযোদ্ধা সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকই ক্ষুণ্ন হতে দিতে চায় না; বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসাবে আমারও তা কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে এদেশের সেনাবাহিনী তার যোগ্য মর্যাদা পাবে–এই প্রত্যাশা দেশবাসীর সঙ্গে আমারও রয়েছে। সেনাবাহিনী জাতির প্রতিবন্ধক নয়; ক্ষমতালোভীদের উচ্চাভিলাষই হচ্ছে সব প্রতিবন্ধকতার উৎস। বঙ্গবন্ধু তাঁর সৈনিকদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যেন পাকিস্তানি মনোভাব না আসে। ...তোমরা হবে আমাদের জনগণের বাহিনী...তোমরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে। যেখানে অন্যায়-অবিচার দেখবে, সেখানে চরম আঘাত হানবে।' বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অসৎ উদ্দেশ্যে যারা ক্ষমতার উচ্চাশায় উন্মাদ হয়ে সামরিক শাসনের চক্রান্তে জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে বন্দি করেছে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা উদ্ধারে বঙ্গবন্ধুর তিল তিল শ্রমে গড়া সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন সমুন্নত থাকবে–এই প্রত্যাশা আমারও রয়েছে।

রচনাকাল: আগস্ট ১৯৮৩, 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত
লেখক: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

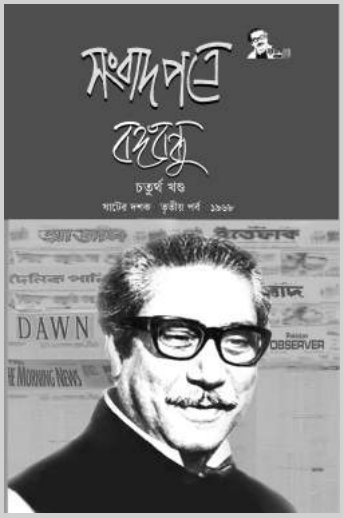

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

‘বাবা’

শেখ রেহানা

জন্মদিনে প্রতিবার একটি ফুল দিয়ে
শুভেচ্ছা জানানো ছিল
আমার সবচেয়ে আনন্দ।
আর কখনো পাবো না এই সুখ
আর কখনো বলতে পারবো না
শুভ জন্মদিন।
কেন এমন হলো?
কে দেবে আমার প্রশ্নের উত্তর।
কোথায় পাবো তোমায়...

যদি সন্ধ্যাতারাদের মাঝে থাকো
আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবো
শুভ জন্মদিন।
তুমি কি মিটি মিটি জ্বলবে?

যদি বিশাল সমুদ্রের সামনে
ঢেউদের খেলার মাঝে থাকো বলবো
শুভ জন্মদিন।

সমুদ্রের গর্জনে শুনবো কি
তোমার বজ্রকণ্ঠ?
পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে মেঘ
নীল আকাশে লুকোচুরি খেলে
তুমি কি ওখানে?
তাকিয়ে বলবো
শুভ জন্মদিন।

এক টুকরো সাদা মেঘ ভেসে যাবে
ওখানে কি তুমি?
আকাশে বাতাসে পাহাড়ে উপত্যকায়
তোমাকে খুঁজবো, ডাকবো
যে প্রতিধ্বনি হবে
ওখানে কি তুমি?
শুভ জন্মদিন।
শুভ জন্মদিন।

লন্ডন, ১৭ মার্চ ২০১০

লেখক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা

সাংবাদিক শেখ মুজিব

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নানা দিক নিয়ে নানাজন লিখছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন–কোনোটা নিয়েই আলোচনা বাদ থাকেনি।

বঙ্গবন্ধুর যারা অতি কাছের লোক, যেমন শেখ ফজলুল হক মনি, তিনিও আজ বেঁচে নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, তাঁর কারাগারের রোজনামচা খুঁজে বের করে প্রকাশ করেছেন। তথাপি বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যের মতো জীবনের সব দিক উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। হিটলারের মৃত্যু ওই বছরেই। তারপর ৭৫ বছর চলে গেছে। আমরা এতকাল জেনেছি হিটলার একজন নিষ্ঠুর চরিত্রের ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাসক ছিলেন। তিনি লাখ লাখ ইহুদি হত্যা করেছেন। কিন্তু এখন হিটলারকে নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর এক ইতিহাসবিদ একটি বই লিখেছেন। লন্ডনের সানডে টাইমসের ম্যাগাজিনের গ্রন্থ-সমালোচনায় বইটির প্রশংসা করা হয়েছে।

হিটলার সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত এই বইটিতে তার চরিত্রের একটি অজানা দিক দেখানো হয়েছে। তিনি কেমন স্বভাবের মানুষ ছিলেন। শিশুদের ভালোবাসতেন। গান শুনতেন। নিজে ছবি এঁকেছেন। হিটলারের চরিত্রের এ দিকটির কথা এতদিন চাপা রাখা হয়েছিল।

হিটলার যতটা নিষ্ঠুর ছিলেন, এর চেয়ে অনেক নিষ্ঠুর ও নরপশু হিসেবে তাকে দেখানো হয়েছে। হিটলারের শত্রুপক্ষের এটা ছিল একতরফা প্রচার। একজন ইতিহাসবিদ তাই বলেছেন, ইতিহাস হচ্ছে জয়ীর ইতিহাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যদি হিটলার জয়ী হতো, তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। হিটলারের বদলে চার্চিলকে দেখানো হতো নরদানব হিসাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হিটলার ছিলেন না। ছিলেন তার বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনি লড়াই করেছেন ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি জনগোষ্ঠীর মুক্তি ঘটানোর জন্য। তাদের বিলুপ্ত জাতিগত পরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতি উদ্ধার করার জন্য।

তিনি তাঁর দেশ ও জাতির জন্যই জীবন দান করে গেছেন। তথাপি এই মানুষটির চরিত্রেও কলঙ্কলেপনের চেষ্টা করেছে তাঁর শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল দেশি-বিদেশি চক্র। তাঁকে স্বৈরাচারী বানিয়ে, তাঁর বাকশাল শাসন পদ্ধতিকে একদলীয় শাসন প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করেছে।

দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করেছে। সোভিয়েত নেতা স্টালিনকে যেমন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর একদল ইতিহাসবিদ হিটলারের মতো একই চরিত্রের ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর হিসেবে দেখাতে চান, তেমনি তাদের মতো বাংলাদেশেও একশ্রেণির লোক বঙ্গবন্ধুর চরিত্র বিকৃত করতে চেয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রহননের এই চেষ্টা সফল হয়নি। বরং সব আরোপিত কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু আজ জাতির পিতা এবং রাষ্ট্রের স্থপতির আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। দেশের সেরা বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদরা তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছেন।

কিন্তু তাঁর মহাকাব্যের মতো জীবনের সব দিক উত্থাপিত হয়নি। ধীরে ধীরে তা অবশ্যই হবে। আজ আমি তাঁর জীবনের একটি দিক আলোচনা করব, যা হয়তো অনেকেরই জানা। কিন্তু আলোচিত হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সাংবাদিকতাও করেছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ 'সাপ্তাহিক মিল্লাত' নামে একটি কাগজ বের করে। এই কাগজের প্রধান সম্পাদক ছিলেন আবুল হাশেম এবং সম্পাদক ছিলেন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস।

বঙ্গবন্ধু তখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ) পড়েন এবং বেকার হোস্টেলে থাকেন।

নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের যে অংশ তখন হাশেম-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতিশীল অংশের সমর্থক, বঙ্গবন্ধু সেই গ্রুপের একজন নেতা ছিলেন। তিনি মিল্লাত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। এমনকি এই পত্রিকা বিক্রির জন্য ছোটো একটি ছাত্র-গ্রুপ নিয়ে হাওড়া ও শেয়ালদা স্টেশনে যেতেন।

কখনো সোহরাওয়ার্দী বা আবুল হাশেমের সঙ্গে মফস্বল সফরে গেলে মিল্লাত পত্রিকা সঙ্গে নিতেন প্রচার বৃদ্ধির জন্য।

দৈনিক আজাদ তখন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নাজিমউদ্দীন গ্রুপের সমর্থক। আবুল হাশেম ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে আজাদ কৌশলে প্রচার চালাত। বঙ্গবন্ধু ছদ্মনামে এই প্রচারণার কোনো কোনোটির জবাব লিখতেন ছোটো ছোটো প্রবন্ধের মাধ্যমে।

তাঁর এই সাংবাদিকতার কথা আমি বহু পরে জানতে পারি কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের মুখে, যখন তিনি ঢাকায় অবজারভার গ্রুপের বাংলা সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা'র সম্পাদক–সময়টা ১৯৬৬ কী '৬৭ সাল। ইদরিস ভাই শেখ মুজিব কোন ছদ্মনামে মিল্লাতে অনিয়মিতভাবে লিখতেন, সেই নামটাও বলেছিলেন। নামটা ছিল মখ্‌লিক।

আমার ইচ্ছা ছিল কথাটার সত্যতা একসময় বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি মিল্লাতে মাঝেমধ্যে লিখতেন, সেকথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু নিজের ছদ্মনাম কী ছিল, স্মরণ করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও তাঁর সাংবাদিকতার কোনো কথা উল্লেখ করেননি। সম্ভবত এটিকে তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, তখন হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের উদ্যোগে দৈনিক ইত্তেহাদ বের হয় কলকাতা থেকে।

১৯৯ পার্ক স্ট্রিটে ছিল ইত্তেহাদ অফিস। আবুল মনসুর আহমদ হন

তাঁর এই সাংবাদিকতার কথা আমি বহু পরে জানতে পারি কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের মুখে, যখন তিনি ঢাকায় অবজারভার গ্রুপের বাংলা সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা'র সম্পাদক–সময়টা ১৯৬৬ কী '৬৭ সাল। ইদরিস ভাই শেখ মুজিব কোন ছদ্মনামে মিল্লাতে অনিয়মিতভাবে লিখতেন, সেই নামটাও বলেছিলেন। নামটা ছিল মখ্‌লিক

সম্পাদক। পত্রিকাটি তরুণ প্রজন্মের বাঙালি মুসলমান পাঠকদের মধ্যে বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টি ছিল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের দিকে। তিনি তাদের সাংবাদিকতার দিকে টানতে চেয়েছেন। তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (পরবর্তীকালে ঢাকায় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) দিকে।

মানিক মিয়া চাকরি নিয়েছিলেন ইত্তেহাদের ব্যবস্থাপনা বিভাগে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইত্তেহাদে দু-চার কলম লিখতেন। তিনি তাকে সাংবাদিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। শেখ মুজিবকেও উৎসাহ দিয়েছিলেন।

কিন্তু শেখ মুজিব তাকে বলেছিলেন–মনসুর ভাই, মিল্লাতের মতো ইত্তেহাদেও আমি লিখব। কিন্তু সাংবাদিক হব না। সাংবাদিকতা আমার নেশা। কিন্তু পেশা রাজনীতি। আমি রাজনীতিক হব।

বঙ্গবন্ধুর মতো মানিক মিয়াও ছিলেন মুসলিম লীগের হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সমর্থক। একই রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী।

সম্ভবত কলকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর থিয়েটার রোডের বাসা অথবা ইত্তেহাদের পার্ক স্ট্রিটের অফিসে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়ার পরিচয়, এই পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। স্থাপিত হয় বড়ো

ভাই ও ছোটো ভাইয়ের সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়াকে ডাকতেন মানিক ভাই। মানিক মিয়া তাঁকে ডাকতেন 'মুজিবর মিয়া'।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুজিব-মানিক মিয়া জুটির অভ্যুদয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। একজন রাজনৈতিক নেতা, অপরজন সাংবাদিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই দুটি নাম ইতিহাসে সমানভাবে উচ্চারিত হবে। মানিক মিয়াকে বঙ্গবন্ধু কতটা সম্মান করতেন তার প্রমাণ–বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটির নামকরণ মানিক মিয়া এভিনিউ করা।

বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে আমার আগেকার এক লেখায় লিখেছি, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বরিশালে ১৯৪৯ সালে। আমি নবম শ্রেণির ছাত্র জেনে বলেছিলেন, 'ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকায় আসি এবং বঙ্গবন্ধুকে (তখন মুজিব ভাই ডাকি) খুঁজতে গিয়ে তাঁকে পাই পুরান ঢাকার কারকুন বাড়ি লেনের সাপ্তাহিক ইত্তেফাক অফিসে। বাংলা ভাগের পর মানিক মিয়া কলকাতা থেকে বরিশালে তাঁর বাড়ি ভাণ্ডারিয়া চলে যান।

ঢাকায় তখনও আসেননি। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের উদ্যোগে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়। অফিস ছিল কারকুন বাড়ি লেনে। সম্পাদক ছিলেন ফজলুর রহমান খান।

মুজিব ভাই ইত্তেফাকের সেই সপ্তাহের লেখাজোখা সম্পর্কে সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি আমাকে ইত্তেফাক অফিসে এসে মাঝেমধ্যে লেখাজোখার ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ জানালেন।

বললেন, তিনিও ইত্তেফাকে নিয়মিত না হলেও লিখছেন। রাজনৈতিক ব্যস্ততার জন্য সময় পাচ্ছেন না। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ঢাকায় এলে শেখ মুজিবই তাঁকে ডেকে এনে সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের সম্পাদকের পদ গ্রহণে সম্মত করান। পরে মানিক ভাই যখন চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের আগের বছর দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশ করেন, তখনও তাকে সাহায্য জোগান 'মুজিব ভাই'।

শেখ মুজিব নিজে পত্রিকা বের করেন ১৯৫৬ কী ১৯৫৭ সালে। নাম সাপ্তাহিক 'নতুন দিন'। তিনি নিজে ছিলেন প্রধান সম্পাদক এবং কবি জুলফিকার ছিলেন সম্পাদক। কবি জুলফিকার ছিলেন মুজিব ভাইয়ের রাজনীতির ঘনিষ্ঠ অনুসারী। পত্রিকাটি কিছুদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই সময় বঙ্গবন্ধু একটি আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের নাম 'দুই অর্থনীতির আন্দোলন'। ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে (এখন আছে কি না জানি না) দুই অর্থনীতির দাবিতে তিনি একটি সম্মেলন করেন। তাতে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদরা যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি পাকিস্তানভক্ত অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেনও যোগ দিয়েছিলেন।

এই সভায় শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্যের কনজুমার মার্কেটে পরিণত করার চক্রান্ত করছে। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের কোনো ব্যবস্থাই তারা করছেন না। এমনকি কৃষিব্যবস্থারও সংস্কার করছেন না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি কম, এখানে শিল্পোন্নয়ন দরকার। পশ্চিম পাকিস্তানে অনাবাদি ভূমি বিস্তর। সেখানে কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা হওয়া সংগত। কিন্তু পাকিস্তানের অবাঙালি কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়ন দুটোই চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তারা অধিকৃত উপনিবেশের মতো ব্যবহার করছে। পাট থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শেখ মুজিব শুধু দুই অর্থনীতি নিয়ে বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁর সম্পাদিত নতুন দিন কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন–দুই অর্থনীতি কেন? এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই অবস্থায় বাস্তবতাকে স্বীকার করে দেশের দুই অংশের জন্য দুই ধরনের অর্থনীতি প্রণয়ন ও অনুসরণ দরকার। তার এই প্রবন্ধটি তখন পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া তৈরি করেছিল। নতুন দিন পত্রিকাটি কারও সংগ্রহে আছে কি না জানি না।

কারও কাছে থাকলে তা থেকে এই প্রবন্ধটি গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনায় যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই বাঙালির স্বার্থ অধিকারের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, তা বোঝা যেত। দুই অর্থনীতির আন্দোলন থেকে ছয় দফার আন্দোলন এবং তা থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ–এই ইতিহাসই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

লেনিন বিপ্লবী রাজনীতিক হয়েও সাংবাদিকতা করতেন। নির্বাসিত জীবনে লন্ডন থেকে রুশ ভাষায় ইসক্রা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন। সেই পত্রিকাই ছিল রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মুখপত্র।

বঙ্গবন্ধুও রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সংবাদপত্র বের করেছেন, যা ছিল বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের একটি দীপশিখার মতো। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার পর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। নতুন দিনের প্রকাশ সামরিক সরকার বন্ধ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিকতা সম্পর্কে আরও তথ্য আমার জানা আছে। ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে তা লিখব।

লেখক: প্রবীণ সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

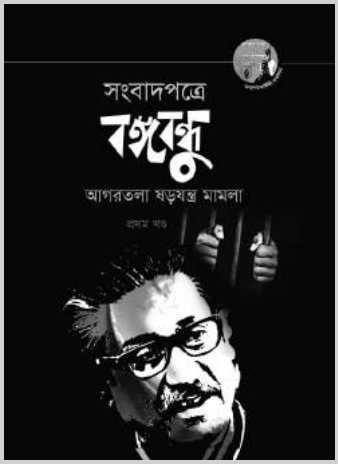

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ

আবেদ খান

বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশায় কীভাবে জন্মদিন পালন করেছেন, এর একটি বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা' স্মৃতিকথার একাংশে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি ছিল ১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই। বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধহয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম।' যারা তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন যে তিনি নিজের জন্মদিনের বিষয়ে কখনোই আগ্রহী ছিলেন না।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগে যখন সেই উত্তাল মার্চের সময়ে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ব্যস্ত সময় চলছিল, সেসময় ৩২ নম্বর ছিল দেশি-বিদেশি সাংবাদিকসমেত সব মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল। বঙ্গবন্ধু নিশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। নেতাকর্মী, স্থানীয়-বিদেশি সাংবাদিক–সব মিলিয়ে তাঁর অতিশয় ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। এমনই এক ব্যস্ততার মধ্যে বিদেশি এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, এই পরিস্থিতে আপনি আপনার এবারের জন্মদিনটি কীভাবে পালন করতে যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার জন্মদিন পালন করি না। যে জাতি অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটায়, কথায় কথায় গুলি করে হত্যা করা হয়, সে জাতির নেতা হিসেবে আমি জন্মদিন পালন করতে পারি না।' গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার আবার জন্মদিন কী, মৃত্যু দিবসই বা কী? আমার জীবনই বা কী? আমার জনগণই আমার জীবন।'

এই আমাদের পিতা। সামান্যতম ক্লান্তি নেই, চেহারার মধ্যে এতটুকু বিরক্তির ছাপ নেই। অত্যন্ত শান্তভাবে তিনি নানা জনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, নেতাকর্মীদের নানা ধরনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আন্দোলনের ব্যাপারে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

আমরা ইতিহাসে অনেক রাষ্ট্রনায়কের রাষ্ট্রপরিচালনার কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক কাহিনি শুনেছি। পাঠ করেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের নানা ধরনের নির্দেশ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনবদ্য ভূমিকা সব তুলনার উর্ধ্বে। আমরা এমন একটা সময় নিয়ে আলোচনা করছি, যে সময়টা একটি নতুন জাতির আবির্ভাবের পূর্বক্ষণ, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে নতুন শক্তির স্ফুরণের লগ্নে। পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অচলায়তন চূর্ণবিচূর্ণ করে নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের অসম সাহসী সন্ধিক্ষণ। ঠিক এই মুহূর্তে অত্যন্ত নির্মোহভাবে যিনি নির্ণয় করতে পারেন ইতিহাসের গতিমুখ, তাঁকে আমরা কোন অভিধায় অভিষিক্ত করব? তিনি তো মানুষের সাধারণ গুণাবলির আরও উর্ধ্বে অসাধারণ মহিমায় উদ্ভাসিত এক মহামানব।

আমরা আজ ইতিহাসের কোনো চরিত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা এমন একটি মানুষের কথা বলব, যিনি ইতিহাসকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আমরা এমনই একজন মানুষের কথাই এখানে তুলে আনব, যিনি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে

আমরা আজ ইতিহাসের কোনো চরিত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা এমন একটি মানুষের কথা বলব, যিনি ইতিহাসকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আমরা এমনই একজন মানুষের কথাই এখানে তুলে আনব, যিনি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন

সব অনাচার-নির্যাতন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি জাতিসত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলত, তা তাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষাকে তিনি আত্মপরিচয়ের ভাষায় পরিণত করার অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা–তিনি এই জাতিকে একটি ভৌগোলিক ঠিকানা দিয়েছেন। সার্বভৌমত্বের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে এটা এমন একটি জাতিরাষ্ট্র, যা কারও অনুগ্রহের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়নি। নিজস্ব শক্তিতে, নিজস্ব ক্ষমতায়, অনেক রক্ত-ঘাম এবং ত্যাগের বিনিময়ে তার নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে বাঙালির সংখ্যা ৩৫ কোটির মতো। তারা বিভিন্ন দেশের নাগরিক হতে পারে; কিন্তু তার গৌরবের বিষয়টা হলো সে নির্দ্বিধায় দাবি করতে পারে যে তার ঠিকানা বাংলাদেশ। কারণ বাঙালির একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে, নিজের পরিচয় আছে, নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কীর্তিতে। তিনি এমনই একটি দেশ উপহার দিয়েছেন পৃথিবীকে, যেই পৃথিবীর প্রতিটি বাঙালি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে–আমার একটি দেশ আছে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, দীর্ঘ সময় এই মানুষটিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই পাপ সংঘটিত হয়েছে সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। তখন এই মহামানবের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ ছিল না। তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ব্রাত্য হিসাবে চিত্রিত করা হতো। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত নীতিমালা কিংবা তাঁর অনুসৃত পথকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু ইতিহাসের পরিক্রমায় সত্যের জয়, আদর্শের জয় সুনিশ্চিত। আর তাই বঙ্গবন্ধুও ইতিহাসের গতিধারায় বাহিত হয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁর মহিমা নিয়েই ফিরে আসেন বারবার।

কিছু মানুষ থাকেন যারা ইতিহাসে উদ্ধৃত হন, কেউ আছেন যারা ইতিহাসের অংশ হয়ে যান আর এমন সামান্য কয়েকজন আছেন, যারা নিজেরাই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। বঙ্গবন্ধু এই শেষোক্ত পর্যায়েরই মানুষ। যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস, সৃষ্টি হয়েছে গাঙ্গেয় বদ্বীপের একটি বিশাল জাতির জন্মগাথা। এই একটি মানুষ, যার কর্মজীবনের প্রতিটি স্তরে রচিত হয়েছে এক মহান মুক্তিসংগ্রামের অমর পঙ্‌ক্তিমালা। বাঙালির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান ছিল না, কখনো তার আত্মপরিচয়ের ইতিহাস ছিল না। এই মহান মানুষটি এই জাতির অপ্রাপ্তির যাতনার অবসান ঘটিয়েছেন। এখন বাঙালি জাতির একটা ঠিকানা আছে, একটা জাতীয় সংগীত আছে, একটা পতাকা আছে, একটা স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড আছে। এসব কিছুর পেছনে যার অখণ্ড অবদান আছে, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে বিশ্বনন্দিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে ভেবেছিল বাংলাদেশের হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো–যতই সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, ততই তিনি অধিকতর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে পরিব্যাপ্ত হচ্ছেন। তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর জাদুকরী সাংগঠনিক ক্ষমতা, তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এখনো একইভাবে সবাইকে সম্মোহিত করে চলেছে।

বঙ্গবন্ধু যে কতখানি সাহসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন, তার দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুটি ঘটনার কথা সম্ভবত অনেকেই জানেন। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেও সেই শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে; কিন্তু আমি যে দুটি ঘটনার কথা বলতে চলেছি, শুধু সাহসী বললেও কম বলা হবে। রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো।

প্রথম ঘটনাটির সময়কাল ষাটের দশকের শেষার্ধ। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে ছয় দফা পেশ করেছেন এবং সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন মুক্তিসনদের পতাকা নিয়ে। ক্ষমতায় তখন পাকিস্তানের স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি তখন আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য সব রকম দমন নীতির কৌশল প্রয়োগ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুকে বারবার মামলা দিয়ে, বন্দি করে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শীর্ষপর্যায় থেকে শুরু করে মাঝারি সমর্থক পর্যন্ত সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের হয়রানি। অবশেষে সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুকে, গ্রেফতার করা হলো সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে, কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বেশ কয়েকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকেও। সামরিক আদালতে শুরু হলো কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। বিচারক্ষেত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। প্রত্যেক অভিযুক্তকে অমানুষিক এবং লোমহর্ষক নির্যাতন করা হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। উদ্দেশ্য, শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যে পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা যে-ই করবে, তাকেই ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে। আইয়ুব খানের সামরিক জান্তার নিশ্চিত ধারণা ছিল শেখ মুজিবের ছয় দফার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অতএব, যেভাবেই হোক বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা করে হলেও রক্ষা করতে হবে পাকিস্তানকে।

সামরিক আদালতে বিচার শুরু হলো। সরকারি নির্দেশ, পত্রিকা প্রকাশের সময় এমন একটি শব্দও লেখা যাবে না বা আকারে-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করা যাবে না বা কৌশলে এমন ধারণাও দেওয়া যাবে না, যা থেকে মনে হতে পারে অভিযুক্তদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় আসামিদের নির্ধারিত পরিণতিই হচ্ছে ফাঁসির কাঠগড়া। বিচারকের আসনে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারা, যারা সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত যে কী রায় দিতে হবে।

সাক্ষী আর আসামিদের আনা হলো সামরিক এজলাসে। মুহূর্তেই ঘটে গেল নাটকীয় ঘটনা। যেসব আসামিকে রাজসাক্ষী বানানো হয়েছিল, তারা একে একে আদালতে বলতে শুরু করলেন তাদের ওপর কী ধরনের অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য। হতচকিত সামরিক আদালত একের পর এক রাজসাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করতে শুরু করল। মামলার এক নম্বর আসামি শেখ মুজিবকে কাঠগড়ায় একটা কাঠের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল বসার জন্য। অনতিদূরে প্রেসবক্স। সেখানে 'দৈনিক আজাদ'-এর রিপোর্টার হিসাবে উপস্থিত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কোনোভাবেই আসামিদের সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে পারবে না। তেমনটি ঘটলে কঠোর শাস্তি। শেখ মুজিব সামরিক আদালতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাস্যপরিহাসরত মুঠোবন্দি তাঁর বিখ্যাত পাইপ। এমন সময় তাঁর চোখ পড়ল তাঁরই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের দিকে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন, 'ফয়েজ, এই ফয়েজ।' ফয়েজ আহমদ সামরিক নির্দেশনামা মেনে ঘাড় নিচু করে আসনে বসে রইলেন। সামরিক আদালতের বাঘা বাঘা কর্মকর্তাদের কুঞ্চিত ভ্রু। দু-তিনবার ফয়েজ আহমদকে ডাকলেন তিনি। হঠাৎ যেন গোটা সামরিক এজলাস এক বজ্রকণ্ঠে প্রকম্পিত হলো। সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল মেঘমন্দ্র গর্জনে।

'কী রে ফয়েজ, কথা ক'স না কেনো? শোন, আমার বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের কথা শুনতে হবে।' থতমত খেয়ে বিপর্যস্ত এজলাস। বিহ্বল দৃষ্টিতে বসে বিচারকরা। সেদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল মামলার কার্যক্রম। এই হলেন আমাদের সাহসী নেতা।

আরেকটি ঘটনা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের। সেই ঘটনার কথা লিখেছেন আরেকজন। তিনিও বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য প্রয়াত খ্যাতিমান সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল তাঁর 'মুজিবের রক্ত লাল' গ্রন্থে।

১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলজিয়ার্সের চতুর্থ জোটনিরেপেক্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিশ্বনেতারা। ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, ফিদেল কাস্ত্রো, নরোদম সিহানুক, বাদশাহ ফয়সাল, হুয়ারি বুমেদিন, আনোয়ার সাদত, আলেন্দেসমেত অনেক বিশ্বনেতা। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের চেষ্টায় সম্ভব হলো একটি অতিশয় দুরূহ সাক্ষাৎকার। সৌদির বাদশাহ ফয়সাল এবং বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারটি ছিল খুবই স্বল্পকালীন। সৌদি আরব বাংলাদেশকে তখন স্বীকৃতি দেয়নি বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সর্বাংশে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ-বিরোধীদের বিভিন্ন তৎপরতায় সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে যে কথাবার্তা হয়েছিল দোভাষীর মাধ্যমে দুজনের মধ্যে, সেটা হুবহু তুলে ধরছি মুকুল ভাইয়ের বর্ণিত গ্রন্থটি থেকে:

'...বাদশাহ: এক্সেলেন্সি, আমি শুনেছি যে আসলে বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশী। কিন্তু কথা হচ্ছে আপনারা কোন ধরনের সাহায্য চান? দয়া করে বলুন আপনারা কী চান? অবশ্য এসব সাহায্য দেওয়ার জন্যে আমাদের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে।

মুজিব: এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি নেবেন না। আমি হচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমার তো মনে হয় না, মিসকিনের মতো বাংলাদেশ আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে?

বাদশাহ: তাহলে আপনারা কিংডম অব সৌদি এরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাচ্ছেন?

মুজিব: বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবা শরিফে নামাজ আদায়ের অধিকার চাচ্ছে। এক্সেলেন্সি, আপনিই বলুন সেখানে তো কোনো শর্ত থাকতে পারে না। আপনি সুমহান এবং প্রতিটি বাঙালি মুসলমান আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনি হচ্ছেন পবিত্র কাবা শরিফের হেফাজতকারী। এখানে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। সেখানে আবার শর্ত কেন? এক্সেলেন্সি, আপনাদের কাছ থেকে ভ্রাতৃসুলভ সম্মান ও ব্যবহার প্রত্যাশা করছি।

বাদশাহ: এসব তো আর রাজনৈতিক কথাবার্তা হলো না। এক্সেলেন্সি, বলুন আপনারা কিংডম অব সৌদি এরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাচ্ছেন?

মুজিব: এক্সেলেন্সি, আপনি জানেন এই দুনিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। তাই আমি জানতে চাচ্ছি, কেন সৌদি আরব আজও পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না?

বাদশাহ: আমি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করি না। তবুও আপনি একজন মুসলমান, তাই বলছি সৌদির স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' করতে হবে।

মুজিব: এই শর্তটা কিন্তু অন্তত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ হলেও এই দেশে প্রায় এক কোটির মতো অমুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সবাই একই সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে হয় শরিক হয়েছে, না হয় দুর্ভোগ পোহায়েছে। তাছাড়া, এক্সেলেন্সি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তো শুধুমাত্র রাব্বুল মুসলেমিন নন, তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামিনও। তিনি তো শুধুমাত্র মুসলমানদের আল্লাহ নন, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র অধিকর্তা। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা। এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি মাপ করবেন। আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি এরাবিয়া' নয়। এই মহান দেশের নাম আরব জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও রাজনীতিবিদ মরহুম বাদশাহ ইবনে সউদ-এর সম্মানে 'কিংডম অব সৌদি এরাবিয়া', কই আমরা তো এই নামে কোনো আপত্তি করিনি?

বাদশাহ: এছাড়া আমার অন্য একটা শর্ত রয়েছে এবং তা হচ্ছে অবিলম্বে সমস্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দিতে হবে।

মুজিব: এটা তো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। দুটো দেশের মধ্যে এ ধরনের আরও অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে; যেমন ধরুন বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ পাকিস্তানি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া, বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা–এই ধরনের বেশকিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। এসবের মীমাংসা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই শুধুমাত্র একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নটি পৃথকভাবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। আর এজন্য সৌদি আরবই বা এত উদ্‌গ্রীব কেন?

বাদশাহ: এক্সেলেন্সি, শুধু এই টুকুই জেনে রাখুন, সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। তাহলে এক্সেলেন্সি, আর তো কথা থাকতে পারে না। তবে আমাদের দুটো শর্তের বিষয় চিন্তা করে দেখবেন। একটা হচ্ছে ইসলাম প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা, আর একটা বিনাশর্তে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। আশা করি বাংলাদেশের জন্যে সাহায্যের কমতি হবে না।

মুজিব: একটা বিষয় বুঝিয়ে বললে খুশি হতাম।

বাদশাহ: এক্সেলেন্সি, বলুন কী বিষয়?

মুজিব: প্রায় দু'বছর পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় সেখানকার পরহেজগার মুসলমানরা যে পবিত্র হজ আদায় করতে

পারছেন না, সেই কথা ভেবে দেখেছেন কি এক্সেলেন্সি? এভাবে বাধার সৃষ্টি করা কি জায়েজ হচ্ছে? পবিত্র কাবা শরিফে তো দুনিয়ার সমস্ত দেশের মুসলমানদের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। তাহলে কেন এই বাধার সৃষ্টি? কেন আজ হাজার হাজার বাঙালি পরহেজগার মুসলমানকে ভারতের পাসপোর্টে হজ আদায় করতে হচ্ছে? আকস্মিকভাবে এখানেই আলোচনার পরিসমাপ্তি।...'

এম আর আখতার মুকুল এরপরে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে তাঁর তৎকালীন নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর উচ্চারিত একটা আরবি কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, লা-কুম-দ্বিন-কুম-ওয়ালি ইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার)।'

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেসময় নীতির প্রশ্নে, দেশের প্রশ্নে, যুদ্ধবন্দিদের কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতটুকু অনমনীয় এবং আপসহীন ছিলেন। এই সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পরপরই।

এখানে আরেকটি তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে। অনেক বিশ্বনন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে জীবনবোধ ও চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এটা মোটেই বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, পৃথিবীর মুক্তিপ্রয়াসী মানুষের মধ্যে–তা তারা যেখানেই থাকুক না কেন, পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের মধ্যকার সর্বদায় মিল খোঁজার ব্যাপারে একটি উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তেমনই সর্বত্র লক্ষ করা যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও। আমরা পৃথিবীর অনেক মহান ব্যক্তির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পাই। এর মধ্যে মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা একজন। তাঁর জীবনের লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর জীবনের যে আদর্শ, তার সঙ্গে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে রয়েছে অনেক সাদৃশ্য। জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের একটি উক্তি সর্বজনবিদিত। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার মতের সঙ্গে আমি হয়তো একমত না-ও হতে পারি; কিন্তু তোমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে যাব।' তেমনই বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায়ও আমরা দেখতে পাই পরমতসহিষ্ণুতার এক অনন্য ও অনবদ্য উপস্থিতি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি কতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন, তা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখার মধ্যে পরিদৃষ্ট হতে পারে। এ ব্যাপারে নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনের একটি ঘটনার বর্ণনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। গল্পটি ছিল এমন–নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর একদিন তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে বললেন, চলো আজ শহর দেখি। চার দেওয়ালের ভেতর বন্দিজীবনের দীর্ঘ সময় কাটানোর পর নিজের শহরটি কেমন হয়েছে। নিজ চোখে না দেখলেই নয়।

সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলা শহরের অলিগলি হাঁটলেন। একপর্যায়ে বেশ ক্ষুধা লাগার পর ম্যান্ডেলা বললেন, 'সামনের মোড়ে যদি কোনো রেস্তোরাঁ থাকে, সেখানেই খেয়ে নিতে চাই।' শুনে সহকর্মীরা তো অবাক! বুঝতে পেরে ম্যান্ডেলা বললেন, 'অবাক হওয়ার কিছুই নাই; ক্ষুধা লেগেছে, খাব। কয়েদখানার বীভৎস খাবার খেয়েও যেহেতু মরিনি, তাই এত সহজে মরব না।'

সবাই মিলে টেবিলে খেতে বসেছেন। অল্প দূরেই আরেকজন ভদ্রলোক বসে আছেন, বেশ বয়স্ক। হোটেলের ওয়েটারকে ম্যান্ডেলা বললেন, 'একটা চেয়ার এনে আমার পাশে রাখ এবং ওই ভদ্রলোককে বলো- আমার টেবিলে এসে বসে খেতে।' ভদ্রলোক এলেন। এসে ম্যান্ডেলার পাশের চেয়ারটাতেই বসলেন।

খেতে খেতে সবাই গল্প করছে। কিন্তু পাশে বসা লোকটি কিছুই খেতে পারছেন না। তাঁর হাত কাঁপছে। চামচ থেকে খাবার প্লেটে পড়ে যাচ্ছে। তখন ম্যান্ডেলার সহকর্মীদের একজন বললেন, 'আপনি মনে হয় অসুস্থ।' কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে লোকটি চুপচাপ রইলেন, কিছুই বললেন না।

ম্যান্ডেলা তখন নিজ হাতে ওই বৃদ্ধকে খাবার খাইয়ে দিলেন এবং ওয়েটারকে ডেকে বললেন, 'তাঁর খাবারের বিলটাও আমরা পরিশোধ করব।' খাবার শেষে সেই বয়স্ক ভদ্রলোক বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সবাই অবাক চোখে দেখল, লোকটি ভালো করে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারছেন না। শরীরের কাঁপুনি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে!

ম্যান্ডেলা নিজ হাতে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন এবং সহকর্মীদের একজনকে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে বললেন। সহকর্মীদের মধ্যে আরেকজন বললেন, 'এত অসুস্থ শরীর নিয়ে উনি বাড়ি পৌঁছাতে পারবেন তো!'

এ সময় ম্যান্ডেলা বলতে শুরু করলেন, 'উনি অসুস্থ নন। আমি জেলের যে সেলে বন্দি ছিলাম, উনি ছিলেন সেই সেলের গার্ড। প্রচণ্ড মার খেয়ে আমার যখন খুব তৃষ্ণা পেত, পিপাসায় কাতর হয়ে আমি যতবার পানি পানি বলে আর্তনাদ করতাম, ততবারই উনি আমার পুরো শরীরে মূত্রত্যাগ করে দিতেন।'

লক্ষ করার ব্যাপার হলো, লোকটি ম্যান্ডেলার মুখে-শরীরে মূত্রত্যাগ করেছেন। আর ম্যান্ডেলা তাঁরই মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। তিনি যেমন সবার প্রেসিডেন্ট, তেমনই তাঁরও প্রেসিডেন্ট। প্রতিটি নাগরিককে সম্মান জানানো তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। তাঁর আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল 'প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা একটি তৈরি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর সহনশীলতার মানসিকতা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রকে নির্মাণ করতে পারে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষের কাছে। রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় তিনি বিরোধী পক্ষের মতপ্রকাশের অধিকারকেও সব সময় সর্বোচ্চ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি তাঁর শত্রুকেও শ্রদ্ধা করতেন এবং তার মতপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও আদর্শ। সারাজীবন তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষকে ভালোবেসে তাঁর সমগ্র জীবন উজাড় করে দিয়েছেন। কী পরিমাণ ভালোবাসতেন মানুষকে, তা বোঝা যায় তাঁর এই কথায়, 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।'

আজ মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, 'রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব!' প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।' জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়েই মানুষের ভালোবাসার ঋণ তিনি শোধ করেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশি-বিদেশি চক্রান্তের রোষে তাঁকে জীবন দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সরকারগুলোর ভূমিকা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর কার্যক্রম থেকে আজ আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি–বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নষ্ট রাজনীতির প্রবর্তন, লালন, পরিচর্যার পেছনে কারা অদ্যাবধি সক্রিয়। আমরা এখনো দেখি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের মধ্যেও এদেশের মানুষ চালিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের অভিযাত্রা।

আমরা আজ সেই সময় পেরিয়ে এসেছি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এই নিগড় থেকে মুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতনই একইভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী অপশক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

আজ এই মহামানবের ১০১তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

জয় বাংলা।

লেখক: চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও সম্পাদক, দৈনিক জাগরণ

বঙ্গবন্ধু ও পাকিস্তানের রাজনীতিকে অর্থনীতির ধারায় ফেরানো

স্বদেশ রায়

পাকিস্তান সৃষ্টি হয় মুসলিম লীগের রাজনীতির ভেতর দিয়ে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে কোনো অর্থনীতির যোগ ছিল না। শুধু ধর্মের নামে এবং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু–এ দুই বিষয়ের ওপর ভর করেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। যে কারণে রাষ্ট্রটি প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাঠামো অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্র হচ্ছে কি না, আর তা না হলে এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কী–এসব কোনোকিছুই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা চিন্তা করেননি। বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবনে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একজন কর্মী হিসাবে নির্বাচনি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেন। তবে মুসলিম লীগের অন্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির একটা পার্থক্য ছিল। বঙ্গবন্ধুর কাজ লক্ষ করলেও যেমন বোঝা যায়, তেমনই তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীও মনোযোগের সঙ্গে পড়লে বোঝা যায়, তিনি নির্বাচনটিকে নিয়েছিলেন, পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলিমের মুক্তির একটি উপায় হিসাবে। একজন প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ হিসাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলিমদের জীবনকে শুধু দেখেননি, উপলব্ধিও করেছিলেন তাঁদের কষ্ট। একজন অতিমানবিক হৃদয়ের তরুণ হিসাবে তিনি ব্যথিত ছিলেন তাঁদের অর্থনৈতিক কষ্টে। তাছাড়া তখন পাকিস্তান প্রস্তাবটি ছিল লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: "...the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North- Western and Eastern Zones of the India, should be grouped to constitute

'Independent States' in which constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for the minorities in these unites and these regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in constitution with them;…"

লাহোর প্রস্তাবের এই 'স্টেটস'-এর 'এস' বাদ দিয়ে যে একটি কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র তৈরি হবে–এমনটি তখন কোনোমতেই বঙ্গবন্ধুর মতো সৎ ও উদার তরুণ মুসলিম লীগ কর্মীদের মাথায় আসেনি। তাদের মাথায় আসেনি, ধর্ম ব্যবসায়ীরা এই রাষ্ট্র তৈরির আগে ইংরেজের ইন্ধনে ও কূটখেলায় ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করবে। যার ভেতর দিয়ে স্বায়ত্তশাসিত স্টেট তো হবেই না, সঙ্গে সঙ্গে উবে যাবে মাইনরিটির সব ধরনের স্বাধীন অধিকার। তাই মুসলিম লীগের এই সৎ ও উদার কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো রক্তাক্ত ওই পাকিস্তানের ক্ষমতার সোপান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ততদিনে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এই তরুণ উপলব্ধি করেন ধর্মীয় রাজনীতির প্রকৃত রূপ। যে কারণে আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে। তিনি এও উপলব্ধি করেন, ধর্মের নামে কোনো দেশ হতে পারে না। ধর্মের নামে কেউ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে পারেন না। তাই তাঁকে নিয়ে তৈরি পাকিস্তানের গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, তিনি ১৯৪৭ সালেই ফরিদপুরে জনসভা করে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ না করার জন্য বলছেন।

> পাকিস্তানের রাজনীতিতে বা পাকিস্তান সৃষ্টিতে যেখানে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ধর্ম। বঙ্গবন্ধু সেই দেশে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। অভাব থেকে মুক্তি

অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধিতে আমরা তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে পাচ্ছি: এক. পূর্ব বাংলার মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিমরা যে আর্থিক মুক্তির জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলেন, সেই পাকিস্তান হয়নি। দুই. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়মবহির্ভূত একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তিন. এই রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ধর্মের নামে যে নরহত্যা হয়েছে, তা শুধু অমানবিক নয়, চিরস্থায়ী এক ক্ষত।

এই তিন উপলব্ধি থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে প্রাথমিকভাবে যে সিদ্ধান্তগুলো নিতে দেখা যায় তা হলো–রাজনীতি হতে হবে সবার জন্য, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়। আর রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হতে হবে মানুষের মুক্তি। যে মুক্তির প্রথম শর্ত অর্থনৈতিক মুক্তি। মানুষের এই অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়াও আরও অনেক মুক্তির প্রয়োজন। তবে এটাই সত্য–সব মুক্তির পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক মুক্তি। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি এলে ধীরে ধীরে মানুষ অন্য সব মুক্তির দিকে এগোয়।

পাকিস্তানের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন যে রাজনৈতিক দলটি গঠন করা হয়, তার উদ্দেশ্য যদিও ছিল সব মানুষের জন্য একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম গড়ে তোলা; কিন্তু তখনও পাকিস্তানে সেই পরিবেশ শতভাগ সৃষ্টি হয়নি। তাই আওয়ামী (জনগণের) লীগ না গড়ে প্রথমে তাঁদেরকে গড়তে হয়েছিল জনগণের মুসলিম লীগ। অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগ। কিন্তু এই আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ার আগের থেকেই পাকিস্তান গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে–বঙ্গবন্ধু যেখানে মিটিং করছেন, সেখানেই তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের খাদ্যাভাবের কথা বলছেন। অর্থাৎ পাকিস্তানে নতুন রাজনীতি শুরু করার আগের থেকে তিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন, সেখানে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত ১৯৪৭-১৯৪৮-এর পাকিস্তান গোয়েন্দা রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধু চাচ্ছিলেন মুসলিম লীগ দরিদ্র মুসলিমের দল হোক। তাঁর ওই সময়ের বক্তব্য থেকে (যেসব বক্তব্য গোয়েন্দারা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন) এটা স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধুর এই কাজের অন্যতম বড়ো বাধা ছিলেন মওলনা আকরম খাঁ। তিনি মুসলিম লীগকে তার পকেট লীগে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই দরিদ্র মুসলিমসহ পূর্ব বাংলার সব দরিদ্র মানুষের মুক্তির লক্ষ্যেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠা করা হয়, পাকিস্তানি প্রশাসন সেসময়ে বঙ্গবন্ধুকে জেলে রেখেছিল। তিনি মুক্তি পান ২৭ জুলাই। এর মাত্র কিছুদিনের মধ্যে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গবন্ধুই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজনীতিতে বা পাকিস্তান সৃষ্টিতে যেখানে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ধর্ম। বঙ্গবন্ধু সেই দেশে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। অভাব থেকে মুক্তি। সত্যি বলতে কী, পাকিস্তানের রাজনীতিতে অর্থনীতিকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গবন্ধুই করেন। কেউ কেউ বলতে পারেন, কমিউনিস্টরা তার আগের থেকে অর্থনীতি নিয়ে রাজনীতি করছিলেন। তারাই এটা শুরু করেন। তবে বাস্তবতা বলে, কমিউনিস্টরা তখন এতটাই বিপর্যস্ত ছিল যে তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে মূলধারায় এসে এ ধরনের কোনো রাজনীতি করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া কমিউনিস্টরা তখন নিজেদের আদর্শের দ্বন্দ্ব নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, দেশের রাজনীতি নিয়ে তাদের ভাবার সময় ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে আরেকটি বড়ো দিক হলো, শুধু বিরোধী দলে থেকে তিনি জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য আন্দোলন করেননি। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে, তখনও তিনি যেমন জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য লড়েছেন–এমনকি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকার–সরকারের নেতৃত্বে তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সেসময়েও তিনি জনগণের আর্থিক দুর্দশার কথা বলতে ভোলেননি।

১৯৫৬ সালে যেসময় আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী, সেসময়ে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ২ থেকে ১২ জুলাই ইত্তেফাকের রিপোর্টের ভেতর

দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ওই সময়ে ব্যস্ততা ও গৃহীত পদক্ষেপের কিছু অংশ প্রত্যক্ষ করলেই স্পষ্ট হয় যে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের খাদ্য বা অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে সেদিন কতটা সোচ্চার ছিলেন। কীভাবে তিনি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকে নিয়ে এসেছিলেন। ২ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ:

২ জুলাই ১৯৫৬: আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিব আহূত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার ও মন্ত্রিসভা শোচনীয় ব্যর্থতার চরম কেলেঙ্কারির পরিচয় দিয়েছে।

৩ জুলাই ১৯৫৬: ৮ জুলাই 'খাদ্য দাবি দিবস' (আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুমোদন)। খাদ্য দাবি দিবসকে সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান যে বিবৃতি দেন তা ছিল–৮ জুলাই 'খাদ্য দাবি দিবস' পালনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৩০ জুনের সভায় তা অনুমোদন করা হয়েছে। ওই দিবসের কর্মসূচি হচ্ছে জনসভা অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা। এই দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জনসভার প্রস্তাবাবলি অনুগ্রহপূর্বক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা এবং ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে পাঠানো যেতে পারে।

৪ জুলাই ১৯৫৬: আওয়ামী লীগের উদ্যোগে খাদ্যের দাবিতে মুন্সীগঞ্জে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। এরপর মুন্সীগঞ্জে প্রকাশ্য জনসভা হয়। এই জনসভায় বক্তব্য দেন শেখ মুজিবুর রহমান, বাবু রাধা মাধব দাস, কোরবান আলী প্রমুখ।

৭ জুলাই ১৯৫৬: খাদ্য দাবি দিবস পালনে বাধা হিসাবে শহরে ১৪৪ ধারা জারির নিন্দা করে শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিব বলেন, "আগামীকাল হইতে শহরে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারির নিন্দা করার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সরকার মন্ত্রিসভার (আবু হোসেন সরকার, কেএসপি নেতা) ইহাই নবতম অগণতান্ত্রিক কীর্তি। সরকার জানিতেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ৮ জুলাই খাদ্যের দাবিতে শহরে এক সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই ১৪৪ ধারা জারির যে কারণ দেখানো হইয়াছে তাহা অতীব ন্যক্কারজনক। কারণ, আওয়ামী লীগ পরিচালিত কোন সভা কিংবা শোভাযাত্রার ফলে কখনও শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। আদেশটি তাই স্পষ্টভাবে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের খেলাপ। 'সরকার মন্ত্রিসভা' খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল অপকর্ম, কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি ঢাকিবার জন্যে প্রত্যহ মৃত্যুপথযাত্রী হাজার হাজার নিরন্ন জনসাধারণকে সাহায্য দানে ব্যর্থ হইয়া এই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।" (ইত্তেফাক, ৭ জুলাই ১৯৫৬)।

৭ জুলাই, ১৯৫৬: প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান আজ (শনিবার) ৫৬ সিম্পসন রোডে অবস্থিত আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করেন। তিনি জানান, সভায় খাদ্য দাবি দিবসকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। এদিন সন্ধ্যায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা ১৪৪ ধারা জারির তীব্র নিন্দা করে। ঢাকায় ওইদিন খাদ্য দাবি দিবস পালন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০ জুলাই ১৯৫৬: শেখ মুজিব এদিন পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সমস্যা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অভিহিত করার জন্যে করাচি পৌঁছান।

১২ জুলাই ১৯৫৬: করাচিতে শেখ মুজিবুর রহমান এমপি পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থা নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের ১৯৫৬ সালের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১১ দিনের একটি ছবি ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিবৃতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা তুলে ধরার ভেতর দিয়ে বেশকিছু বিষয় আমরা লক্ষ করতে পারি। প্রথমত, ওই সময়ের খাদ্য অভাব মেটানোর দাবিতে এই ১১ দিন নিরলসভাবে বঙ্গবন্ধু একটার পর একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিচ্ছেন এবং তিনি মুন্সীগঞ্জেও যেমন জনসভা করতে যাচ্ছেন, তেমনই ছুটে যাচ্ছেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর কাছে করাচিতে। অর্থাৎ একজন রাজনীতিক দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কতটা তৎপর হতে পারেন, এটা তার একটি সর্বোচ্চ উদাহরণ। আর এই ১১ দিনই শুধু নয়। শেষ অবধি এই খাদ্যের দাবিতে বঙ্গবন্ধু রাজপথে মিছিল করতে গিয়ে রক্তাক্তও হয়েছিলেন। ওই মিছিলের প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন রিপোর্টার, পরবর্তী সময়ে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক জিয়াউর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার ১৯৯২ সালে নিয়েছিলাম। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে জিয়াউর রহমান বলেন, 'সেদিন বঙ্গবন্ধু চকবাজার থেকে খাদ্যের দাবিতে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হন। সদরঘাট এলে সরকারি পুলিশ ওই মিছিলে গুলি চালায়। গুলিতে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আমি নিজে একটি সিনেমা হলে আশ্রয় নিই। সিনেমা হলের কার্নিসে এসে আমি দেখতে পাই গুলিতে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। রাজপথে রক্তাক্ত অবস্থায় একজন একটি রক্তাক্ত আহত দেহ কাঁধে নিয়ে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কার্নিসের দিকে আরও এগিয়ে চিনতে পারি তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।'

এ থেকে নিশ্চয়ই বলা যায়, ১৯৪৭-এ ধর্মের নামে ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গার ভেতর দিয়ে যে রাজনীতির নামে একটি দেশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দেশের রাজনীতি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় একক চেষ্টায় অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রাজপথে রক্তাক্ত হওয়ার অবস্থানে নিয়ে আসেন। রাজনীতির এই পরিবর্তনের একক কারিকর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কাজে তিনি এতটাই আপসহীন ছিলেন যে, কেন্দ্রে যখন আওয়ামী লীগ সরকার, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখনও তিনি মানুষের অর্থনৈতিক কষ্ট বা খাদ্যের কষ্টের কথা বলতে পিছপা হননি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পার্লামেন্টে বলছেন, খাদ্যের অভাব পূরণ করেছেন তিনি। সরকারি দলের সদস্য হিসাবে বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করে বলছেন, মাননীয় স্পিকার, প্রধানমন্ত্রীর কথা সঠিক নয়। আমি একদিন আগেও পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় ছিলাম। সেখানে চলছে খাদ্যাভাব।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সালের ভেতর বঙ্গবন্ধু একাই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির ধারা প্রবাহিত করেছিলেন রাজনীতিতে। আর এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ছয় দফা, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় বিপ্লবে উন্নীত করেছিলেন রাজনীতিকে, জাতি ও দেশকে। আওয়ামী লীগের ৭০ বছরে দেশ আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উদাহরণ হিসাবে মাথা উঁচু করেছে বিশ্বে। এর সূচনাটি এভাবেই আওয়ামী লীগের শুরুতে শেখ মুজিবুর রহমান নামক একজন দীর্ঘদেহী, আজানুলম্বিত বাহুর বীর স্বাপ্নিকের হাতেই শুরু হয়েছিল।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক এবং সম্পাদক, সারাক্ষণ ডটকম

বঙ্গবন্ধু বললেন বাঙালির জন্য আলাদা শাসনব্যবস্থা দরকার

–মাহফুজা খানম

অধ্যাপক মাহফুজা খানম–একজন শিক্ষাবিদ, নারীনেত্রী, সমাজসেবী ও মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতাপূর্ব আন্দোলন যুগে ছিলেন ডাকসুর ভিপি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া খেলাঘরসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শিক্ষায় অবদানের জন্য ২০২১ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আপনজন হিসাবে চিনতেন ও জানতেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাবার ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ছোটোবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধুকে মুজিব কাকু বলে ডাকতেন। বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে সেসব স্মৃতিময় মুহূর্ত উঠে এসেছে নিরীক্ষা'র আলাপচারিতায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন– **বনশ্রী ডলি**

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় পারিবারিক সূত্রে, কেমন দেখেছেন তাঁকে...

মাহফুজা খানম: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পারিবারিকভাবে চিনতাম ও জানতাম। এজন্য নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি। ছোটোবেলা থেকেই তাঁকে মুজিব কাকু বলেই ডেকেছি, আপনজন জেনেছি। ছাত্রলীগের একজন কর্মী থেকে আওয়ামী লীগের নেতা–পরে হয়ে উঠেন বঙ্গবন্ধু, সবশেষে জাতির পিতা–এই পুরোটা সময় তাঁকে দেখেছি। এরপর ১৯৭৫ পর্যন্তও দেখেছি, তবে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পর কম দেখেছি, স্বাভাবিক কারণেই তিনি তখন খুব ব্যস্ত থাকতেন।

অধ্যাপক মাহফুজা খানম

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাবার ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। আমার বাবা মুস্তাফিজুর রহমান ছিলেন ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা (এদেশের ইনসিওরেন্স কোম্পানির জনক বলা হয় তাঁকে)। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার, ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি আমাদের ঢাকার স্বামীবাগে ৩৬ নম্বর বাড়িটিতে রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এই বাড়িটি অনেক কিছুর কেন্দ্র ছিল। বহুপথ ও মতের মানুষের আড্ডা-আলোচনায়, মিলনমেলায় সব সময় বাড়িটি সরগরম থাকত। আমার দাদা ছিলেন ব্রিটিশ আমলে ম্যাজিস্ট্রেট মতিউর রহমান খান। আমার দাদা ও চাচা সেসময়ে সরকারি চাকরিতে থাকার পরও বাবা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। সেকারণেই আমারও সুযোগ হয়েছে ছাত্ররাজনীতি করার। আজকের ঢাকা যে অবস্থায়, পঞ্চাশের দশকে ঢাকা–কল্পনাও করতে পারবে না। বাড়িঘর ছিল খুবই কম। পুরো ঢাকায় সব মিলিয়ে ৫০টির মতো (কার বলতে যা বুঝি) গাড়ি ছিল।

সেই সময় দেখেছি, আমাদের বাসায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, খগেন্দ্র মিত্র, কংগ্রেস নেতা আবদুল জব্বার খদ্দর আসতেন (তিনি সব সময় খদ্দরের কাপড় পরতেন)। কমরেড মণিসিংহ, রণেশ দাশগুপ্ত, জিতেন ঘোষ, খোকা দা গোপন মিটিং করতেন আমাদের বাসায়। নানা ধরনের প্রচুর বই ছিল বাসায়। ঢাকায় এমন লাইব্রেরি কমই ছিল, অনেকেই বলেছেন এটা। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরাও আসতেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম মনে পড়ে–খান মঈনউদ্দিন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তালিম হোসেন ও কবি গোলাম মোস্তফা।

রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমানও আসতেন নিয়মিতই। আমার বাবা শেখ মুজিবকে ডাকতেন 'অই মিয়া' বলে। সম্পর্কটাই ওরকম ছিল। শেখ মুজিবকে বাবা বলতেন, অই মিয়া, তুমি দুইদিন পরপর জেলে যাবা, তোমার বউ-পোলাপানরে কে দেখবে? কিছুটা জোর করেই বাবা বঙ্গবন্ধুকে ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে একটা কাজের ব্যবস্থা করেন, যা থেকে মাসে মাসে বঙ্গবন্ধুর পরিবার একটা পরিমাণ অর্থ পেত। শুনেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িটা করার পেছনে আমার বাবার ভূমিকা ছিল। কারণ বঙ্গবন্ধু তো নিজের কথা কখনোই ভাবতেন না। আজীবন মানুষের সুখ-দুঃখই ভেবেছেন। ব্যক্তিজীবনে সবার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বক্তব্যে আর মতামত প্রকাশে ছিলেন দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবাদী। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু রসিকও ছিলেন। সময় পেলে আমাদের মজার গল্প শোনাতেন তিনি। অনেক সময় ভালো গল্পের বই এনে দিয়েছেন। আমাদের বাসায় তাঁর আসা-যাওয়াটা ছিল পরিবারের সদস্যের মতোই। এদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাসায় তাঁর আসা-যাওয়া কমে আসে। ততদিনে কলেজে আমিও যোগ দিই ছাত্ররাজনীতিতে।

আপনার শৈশব-কৈশোরে শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে জানতেন?

মাহফুজা খানম: টুঙ্গিপাড়ার অজপাড়াগাঁয়ে জন্মেছেন, শৈশব থেকেই চারপাশের মানুষের দুঃখ দূর করার কথা ভাবতেন। বৈরী পরিবেশে বড়ো হয়েছেন। একবার তিনি বেরিবেরি রোগে কাবু হলেন। চোখে গ্লুকোমায় ভুগলেন, কত অসুখবিসুখ পার করে লেখাপড়া করেছেন। কলকাতায় গেছেন পড়তে। স্কুলজীবন থেকেই সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেই ছেলেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। দরিদ্র মানুষের জন্য মুঠো মুঠো চাল জমিয়ে তাঁদের মাঝে বিতরণ করতেন। বন্যা হলে লঙ্গরখানা খুলে খাওয়ার ব্যবস্থা করা–এসবই ছিল শেখ মুজিবের জীবনের আদর্শ ও কর্ম। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন করেন। পাকিস্তান চেয়েছেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর মনোজগতে পরিবর্তন আসে। এর বড়ো কারণ–ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যুক্তিতেও আছে যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র টিকে থাকে না বেশিদিন। পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনের রাজনৈতিক স্বার্থ কার কতটা, শেখ মুজিবুর রহমান খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য লড়াই করলেন; কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই শেখ মুজিবই বাঙালির স্বার্থে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার কথা ভাবলেন। পাকিস্তান চাওয়ার মোহ ভাঙতে দেরি হয়নি তাঁর, এটাই তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং দেশপ্রেম ও বাঙালির প্রতি দায়িত্ববোধ। সেটা বোঝা যায় তাঁর পরবর্তী আন্দোলন ও বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস পড়লে। এখনো ভাবলে অবাক হই যে, কী করে তখন রাজনীতিবিদরা মেনে নিলেন এই পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ১২শ মাইল, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি কিছুই মিল নেই। অথচ শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমান ভাইদের স্বার্থ রক্ষা হবে, উন্নয়ন হবে বলে এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা হতে পারে না–এটাই প্রমাণ হলো পরে।

১৯৪৭-এর দেশভাগ যে স্বার্থে করা হলো, ১৯৪৮ সালেই বাঙালির সেই মোহভঙ্গ হতে থাকে। মূলত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক তৎপরতাও শুরু। ৫৬ শতাংশ বাঙালির ভাষা উপেক্ষা করে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার প্রস্তাব যখন হলো, তখন বাঙালি আরও বুঝতে পারে যে পাকিস্তান তাদের জন্য নয়। সহনশীল বাঙালি তখন বাংলাকে একমাত্র ভাষা দাবি না করে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবি করেছে। কিন্তু সেটা নিয়েও সরকার বিভিন্ন টালবাহানা করে। তখন অর্থনৈতিক অবস্থাটাও একটা বড়ো বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানে পাট উৎপাদন হতো এবং তা রপ্তানি করে যা আয় হতো, সবটাই করাচি ও পিন্ডি নিয়ে উন্নয়ন করা হতো। সেখানে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে; কিন্তু এখানে কিছুই করা হয় না। শুধু তা-ই নয়, সবক্ষেত্রেই বঞ্চিত করা হতো বাঙালিদের। তখন আর্মিদের হাতে ছিল সব ক্ষমতা। পশ্চিম পাকিস্তানে সামাজিক ব্যবস্থাটা এমন ছিল যে একদিকে জোতদার, অন্যদিকে নিম্নবিত্তদের বাস। মানসিকতাও সেভাবেই গড়ে উঠেছে তাদের। এই রাজনীতিটা এমন জায়গায় গেল যে অর্থনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শোষণে দুরবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল পূর্ব বাংলা। এর প্রভাব পড়ে বাঙালিদের চাকরির জায়গায়ও। প্রশাসন থেকে শুরু করে কোনো বিভাগের উচ্চপদে বাঙালি কাজ পায়নি। এই পরিস্থিতিগুলোর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বোধটা তৈরি হতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ বলতে গেলে ভাষা আন্দোলনের কথা আসে। সাতচল্লিশের পর থেকে কয়েক বছর রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে যা করেছেন আড়ালে, তার প্রতিফলন ঘটালেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে।

তিনি কারাগারে থেকেও আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। বাঙালি নিজেকে চিনতে ও জানতে শুরু করে। এরপরও রোমান ও গ্রিক হরফে বাংলা লেখা চালুর চেষ্টা করে সফল হয়নি। এরপর বাঙালির শিক্ষা সংকোচন নীতি করতে চাইলে সরকার শরিফ কমিশন করে। তখন আমি ইডেন কলেজের ছাত্রী। এখন যেটা বদরুন্নেসা, তখন সেটাই ছিল ইডেন কলেজ। ১৯৬১ সালে ভর্তি হই, বাষট্টিতে শিক্ষা আন্দোলন শুরু। ১৯৬৩ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে। ধর্মঘট প্রতিদিন। দেওয়াল টপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতাম। মিছিল-মিটিং করে কতদিন পার করেছি। টিয়ার গ্যাস ছোড়া হতো, অনেকে আহত হতো। কিন্তু আন্দোলন থামেনি। একপর্যায়ে এই শরিফ কমিশন রিপোর্টকে বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয় সরকার। এরপর দেনদরবার চলতেই থাকে। এর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোজগতে একটা বিষয় জাগ্রত হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর থাকা যাবে না। বিশেষ করে রাজনীতিবিদসহ ছাত্র ও পেশাজীবীদের মধ্যে। বাঙালির জন্য আলাদা শাসনব্যবস্থা দরকার। এই মনোভাব তখন জোরদার হতে থাকে। বাঙালির এই মনোজগৎ তৈরির পেছনে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মসূচি। এর বিপরীত মনোভাব বা পাকিস্তান অখণ্ড থাকুক–এমন মনোভাবের মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। এই শিক্ষা আন্দোলনের সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কাজ শুরু করি। এই সময়টাতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে যান আবার বের হয়ে রাজনীতি করেন–এমনই তো ছিল তাঁর জীবন।

> বক্তব্যে আর মতামত প্রকাশে ছিলেন দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবাদী। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু রসিকও ছিলেন। সময় পেলে আমাদের মজার গল্প শোনাতেন তিনি। অনেক সময় ভালো গল্পের বই এনে দিয়েছেন

আপনি তো ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কীভাবে জড়ালেন?

মাহফুজা খানম: ১৯৬৬ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী। ১৯৬৬-৬৭ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হই। পরের বার তোফায়েল আহমেদ ছাত্রলীগ থেকে ভিপি নির্বাচিত হয়ে আসেন। ষাটের দশকে দেশের প্রায় প্রতিটি কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রসংসদগুলোয় বিজয়ী হতো। ষাটের দশকে বিশ্বজুড়েই ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক–এ দুই রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু ছিল। একদিকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের দাপট, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র তখন বিশ্বে বেশ প্রভাব ফেলেছে। সমাজতন্ত্র মানে মানবমুক্তির মন্ত্র বলা হয়। সেই মন্ত্র আমাদের সেসময়ের ছাত্রসমাজকে আরেক পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। যে পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সমতা থাকবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমরাও সেই স্বপ্ন দেখেছি। সেই যুগে বিশ্বে সমাজতন্ত্রের আবহ ছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের শাসন-শোষণে বঞ্চিত বাঙালি ছাত্রসমাজের কাছে ছাত্র ইউনিয়নের মানবমুক্তির মন্ত্র একটা প্রভাব তৈরি করতে পেরেছিল। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জয় পেয়েছে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় তখন ছাত্রলীগ সক্রিয় রাজনীতিতে মাঠে ছিল। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ কর্মসূচি পালন করে। জাতীয় ইস্যুতে বা ছাত্রদের দাবি পূরণের আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ একসঙ্গে রাজপথে থেকেছে। দুই দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া ছিল অনেক দৃঢ়।

বঙ্গবন্ধু আপনাকে ছাত্রলীগ করতে বলেছেন কখনো?

মাহফুজা খানম: সে এক মজার স্মৃতি। বঙ্গবন্ধু খুব রসিক ছিলেন। বাসায় আসতেন যখন, বিভিন্ন ধরনের বই দিতেন পড়ার জন্য, গল্প শোনাতেন। একদিন মজা করে বললেন, 'তুই আমার কোলে-পিঠে বড়ো হইলি আর যোগ দিছস ছাত্র ইউনিয়নে, ছাত্রলীগ করলি না।' ছাত্র ইউনিয়ন তখন কমিউনিস্ট পার্টির হয়েও কাজ করে। কমরেড মণিসিংহকে বড়ো ভাই ডাকতেন সবাই, তিনিও ডাকতেন। পকেটে হাত দিয়ে আমায় বলতেন, 'তুই এখন ছাত্র ইউনিয়ন করিস! সেই কোন আমলে বড়ো ভাই আমাকে লাল কার্ড (কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কার্ড) দিয়েছেন দেখবি? এ কথা বলে হাসতে হাসতে পকেটে হাত দিতেন। এমন অনেক মজার টুকরো টুকরো কথা ও স্মৃতি রয়েছে তাঁকে ঘিরে। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের সম্মান করতেন। বলতেন, ছাত্র ইউনিয়নের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে, ওরা সৎ, দেশপ্রেমিক ও পড়ালেখা করে। নিজের দল ও ছাত্রলীগের কর্মীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তখন আন্দোলন-লড়াই করতে হয়েছে। তাই সব সময় বঙ্গবন্ধুর সরাসরি নির্দেশনা পেয়েছি। ছাত্র ইউনিয়ন করেছি; কিন্তু তাঁর ভালোবাসা কম পাইনি একটুও। শুধু আমিই কেন, সবাই তাঁর স্নেহে থেকেছি। ব্যক্তিগতভাবে সবার খোঁজ তিনি রাখতেন। সবাইকে ভালোবাসার অমিত শক্তি তাঁর ছিল আজীবন। আমাকে কখনোই ছাত্রলীগ করার জন্য বলেননি। আরেকটা কথা বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু ও তখনকার নেতাদের কাছে আমরা যা শিখেছি ও পেয়েছি, তা আমাদের পাথেয় হয়েছে। তখন রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক–সবমিলিয়ে পরিবেশ এমনই ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে জয়-পরাজয় মেনে নিয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মানসিকতা ধারণ করেছি। এখনকার প্রজন্মের রাজনীতি যারা করবেন, তাদের এসব জানা দরকার। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত বা প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়েছি। কিন্তু পরদিনই পরাজিত ছাত্রলীগের সদস্যের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছি, হেসে কথা বলেছি, একসঙ্গে খেয়েছি বা কর্মসূচি সফল করেছি। এখনো এমন অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রয়েছে। কিছুদিন আগেও বঙ্গবন্ধুর আরেক সৈনিক, ছাত্রলীগের নেত্রী রাফিয়া আক্তার ডলি ফোন করেছেন। আমাদের সম্পর্ক এখনো তেমনই আছে। সুখে-দুঃখে দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে পরামর্শ করি, করণীয় নিয়ে আমাদের কথা হয়, দেখা হয়।

ছয় দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা কী ছিল আপনাদের ওপর, সেসময়ের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ...

মাহফুজা খানম: ছয় দফা ঘোষণার পর তিনি আমার নেতা হয়ে সামনে আসেন। বঙ্গবন্ধু প্রথম থেকেই আমাদের ডেকে ছয় দফার আসল উদ্দেশ্য বুঝিয়েছেন। কারণ এরই মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন দুই ভাগে ভাগ

হয়ে যায়–মস্কোপন্থি ও চীনপন্থি। চীনপন্থিরা ছয় দফাকে মানতে রাজি নয়। ছয় দফাকে ওরা সিআইএর দলিল বলে ধরে নেয় এবং এতে সমর্থন দেয়নি। কিন্তু আমরা ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ হিসাবেই বুঝেছি। তখন রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই কারাগারে। সেসময়ের সব আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রসমাজ। ছয় দফা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব বিশেষভাবে ছাত্রদের ওপর পড়ে। আমি তখন ডাকসুর ভিপি। সেসময়টাতে কর্মসূচি সফল করার জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে হয়েছে। ঢাকার সাধারণ সভা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হয়েছে ছয় দফার বিষয়ে সভা ও আলোচনা করতে। ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠনে একাট্টা হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাদের। ছাত্রসমাজ বিশেষ করে ডাকসুর ওপর দায়িত্ব দেন তিনি ছয় দফাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এর পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য। তাঁর আদেশ পালন ছিল শিরোধার্য। মেয়ে হয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত জনসভা করতে গেছি। তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খুব একটা সহজ ছিল না; কিন্তু তা উপেক্ষা করেই সভা করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছি। অনেক সময় বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে। পাশাপাশি এটাও দেখেছি অনেকে অফিস ফেলে বক্তৃতা শুনতে এসেছেন। শুনছেন ছাত্ররা কী বলছে। অনেকে সভা শেষে রাতে বাড়িতে ডেকে যত্ন করে খাইয়েছে, থাকতে দিয়েছে। প্রতিদিন মিছিল, মিটিং, টিয়ার গ্যাস, ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হচ্ছে। মিছিল ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। তখন সারাদেশে যাতায়াতব্যবস্থা এত ভালো ছিল না, টিনের পাতের তৈরি খোলা লঞ্চ, মুড়ির টিনের মতো ভাঙা বাস, খারাপ রাস্তা, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে চষে বেড়িয়েছি। এভাবে ছাত্রসমাজ তো বটেই, রাজনৈতিক ও সাধারণ মানুষও ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করেছে। ঢাকার বাইরের সভাগুলোয় দেখেছি সরকারি চাকরি করছেন এমন মানুষও আসতেন আমাদের কথা শুনতে। রাতে ডেকে আমাদের খাওয়াতেন। মনে আছে, পটুয়াখালীতে সভা করতে গেছি। পটুয়াখালীর এসডিও-এর স্ত্রী শামসুন নাহার আপা আমাদের ডেকে খাইয়েছিলেন (যার ছেলের সঙ্গে পরে শেখ রেহানার বিয়ে হয়)।

তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে, একদিকে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু যে সভায় বক্তৃতা করেন, সেই সভাতেই তিনি গ্রেফতার হচ্ছেন, কারাগারে যাচ্ছেন। মুক্ত হয়ে আবার বক্তৃতা করেন। তাঁর নির্দেশনা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে পেয়েছি পুরো সময়।

রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধুর কোন বিষয়গুলো বিশেষ মনে করেন...

মাহফুজা খানম: এখানে একটা কথা বলতেই হবে, ছয় দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু অনড় ছিলেন। বাঙালির জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে আজীবন আপসহীন থেকেছেন। বাঙালিকে পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমষ্টির সুখের চিন্তা করেছেন। সেই আদর্শকে ধারণ করে রাজনীতি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মানসিকতার এই দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে মুসলিম লীগ, এরপর মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে দলের কর্মসূচিতে পরিণত করা–বাঙালির জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে শোষণমুক্তির আন্দোলনে বাঙালিকে শামিল করেছেন এক কাতারে। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধে বিজয় এর বড়ো প্রমাণ। এখানেই তিনি সফল রাজনীতিবিদ আর নেতা। তিনি যে মানবমুক্তি বা বাঙালির মুক্তির কথা ভেবেছেন–এই মানবমুক্তির ভাবনা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কাদের মাধ্যমে? কোন মানুষগুলোর রাজনৈতিক প্রভাব বঙ্গবন্ধুর বোধকে জাগিয়ে তুলেছে, প্রেরণা দিয়েছে–এ বিষয়টিও উল্লেখ করতে চাই। আটচল্লিশের পরে মার্কসবাদীদের সঙ্গে তিনি জেলখানায় থেকেছেন বারবার। কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও আলোচনা হয়েছে অনেকবার। বামপন্থিদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার জগৎ তৈরি হয়েছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সূত্রে। যেমন: আমাদের বাড়িতেই কমরেড অনিল মুখার্জি, রণেশ দাশগুপ্ত, কমরেড মণিসিংহ, জিতেন ঘোষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে সভা করতে দেখেছি। তাদের তিনি সম্মান করতেন, ধারণ করতেন।

বঙ্গবন্ধুর এই বোধ ও আদর্শ তাঁর মধ্যে হঠাৎ করে আসেনি। তিনি তা ধারণ করেছেন তাঁর চারপাশের বহু মত ও পথের জ্ঞানী, গুণী ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সাংবাদিক ও ত্যাগী মানুষের কাছ থেকে।

তবে এটাই সত্যি এবং বাঙালির সৌভাগ্য যে, ছেষট্টিতে ছয় দফা দাবি হিসাবে তুলে ধরার আসল কাজটি করেছেন বঙ্গবন্ধু। সেই দাবিতে তিনি অনড় থেকেছেন, তা আন্দোলনে পরিণত করে বাস্তবায়নের জন্য বাঙালিকে একাট্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির মনোভাব পাঠ করতে পেরেছিলেন। তারা কী চায়, সেটা বুঝেই তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়েছেন। এমন করে তাঁর সময়ের অন্য নেতারা তো বোঝেননি, সাহস করেননি। এজন্যই একজন শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রতি বাঙালির আস্থা, ভরসা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, পরে ১১ দফা দেওয়ার পরও ছয় দফাকেই মানুষ মনে রেখেছে, গুরুত্ব দিয়েছে। এখানেই তাঁর সফলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

বাঙালি ও বাংলাদেশের জন্য তাঁর যে মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও দেশপ্রেম, তা অন্যদের চেয়ে আলাদা। তিনি সব সময় বলতেন, আমার বাঙালি পেট ভরে ভাত খাবে, হাসবে, খেলবে আর সুখে থাকবে। তাঁর চাওয়াটা ছিল সাধারণ আর এটাই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক বিষয়। নিজের জীবনের সবকিছু তুচ্ছ করেছেন তিনি বাঙালির সুখের জন্য, বাঙালির আত্মপরিচয় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর ত্যাগের কোনো তুলনা হয় না। মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে বেশির ভাগ সময় কারাগারে থাকতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর পরিবারকে কতটুকু সময় দিতে পেরেছেন তিনি! সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এখানে তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবের কথা না বললেই নয়। ছোটোবেলায় বিয়ে হয়ে এসেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিবারে। সংসার করার প্রথম থেকেই দেখেছেন স্বামী শেখ মুজিব রাজনীতি করেন, বাড়িতে বেশি থাকতে পারেন না, জেলখানায় যান বারবার। পরের দিকে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধান করা, অন্যদিকে মুজিবকে নিশ্চিন্ত রাখা, সংসারের ঝামেলা থেকে চিন্তামুক্ত রাখা–সবই করেছেন বেগম মুজিব। আওয়ামী লীগের একজন কর্মীর চেয়েও বেশি দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তখন মানুষের হাতে এত অর্থ বা টাকা ছিল না। এর টাকা তারে বা ওর টাকা এরে দিয়ে চালাতে হয়েছে। রাজনীতিবিদদের অর্থবিত্ত কম ছিল। কারও বাড়ি ভাড়া নেই, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চলছে না। এমন অনেক পরিবারকে দেখতে হয়েছে নিজের সংসারের খরচ বাঁচিয়ে। শেখ মুজিবের মহত্ত্ব ও রাজনৈতিক যাপিত জীবন যা দেখেছি, তার কথা বলতে গেলে বেগম মুজিবের কথা আসবেই।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনের পর মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়টা...

মাহফুজা খানম: উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত তো সাতচল্লিশে দেশভাগের পর থেকে বাঙালির বঞ্চিত হওয়ার ইতিহাস। দেশ ভাগ

হলো; কিন্তু বাঙালি তো কিছু পায়নি। আদমজী, বাওয়ানী ২২ পরিবারই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সব সম্পদের মালিক। ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ছয় দফা সরকারি কর্মচারী, সাধারণ মানুষ, ছাত্রসমাজ–সবার মনে জায়গা করে নেয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা ছাত্রদের মাধ্যমেই এর বার্তা আর আন্দোলনের খবর ঢাকা থেকে পৌঁছে যেত গ্রামাঞ্চলে। ছাত্রদের পরিবার ও প্রতিবেশীরা শুনে তাদেরও মনোজগতে পরিবর্তন আসে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। বাঙালি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু বাঙালির নেতা হিসাবে আস্থার জায়গায় পৌঁছালেন। এভাবে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস জন্মায়: হি ইজ আওয়ার লিডার। বাঙালির মুক্তির পথ তিনিই দেখাতে পারবেন।

১৯৬৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পল্টনে ছয় দফার পক্ষে সভা করার কথা মনে পড়ছে। সভায় সভাপতিত্ব করেছি আমি। বক্তৃতা করেছেন তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুর রউফ, জামাল হায়দারসহ আরও কয়েকজন। এর মধ্যে আমাদের আটজনের বিরুদ্ধে হুলিয়া হয়। মেয়ে হয়ে হুলিয়া মাথায় নিয়ে কর্মসূচি পালন করা আমার জন্য ছিল কঠিন জীবন। একপর্যায়ে ছয় দফাকে যুক্ত করে ১১ দফার আন্দোলন শুরু করে ছাত্রসমাজ। ততদিনে ছয় দফা মানুষের চেতনায় জায়গা করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে থামানো যাচ্ছে না দেখে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে কারাগারে নেয়। বাঙালি বুঝে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব ত্রাণকর্তা। তাঁকে কারাগার থেকে যেভাবেই হোক বের করে আনতে হবে। আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বাঙালির ভাগ্যের চাকা সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। তখনকার জিন্নাহ অ্যাভিনিউয়ে বাবার অফিস মানে 'জীবন বীমা' অফিসে তখনও বঙ্গবন্ধু আসা-যাওয়া করতেন। ওই বছর আমার বিয়ে হয় আইনজীবী শফিক আহমেদের সঙ্গে। বিয়ের পর পল্টনে শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় দু-একবার বাবার অফিসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি ও আব্বা অন্যদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

> বঙ্গবন্ধুর এই বোধ ও আদর্শ তাঁর মধ্যে হঠাৎ করে আসেনি। তিনি তা ধারণ করেছেন তাঁর চারপাশের বহু মত ও পথের জ্ঞানী, গুণী ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সাংবাদিক ও ত্যাগী মানুষের কাছ থেকে

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই আন্দোলনমুখী হতে থাকে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সফল হওয়ায় সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রায় সব আসনে জয়ী হলো। কিন্তু ক্ষমতা তো হস্তান্তর করা নিয়ে টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানিরা। একাত্তরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ বাতিলের পর সাধারণ মানুষও বুঝে গেল যে কী হতে যাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। ক্রমেই আমরা সংগঠিত হচ্ছিলাম। তখন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিদিনই সভা-সমাবেশ করছে। মানুষ ঘরে থাকছে না। জনরোষ তখন কিছুই মানছে না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। চার মাসের ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রেখে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে যাই রেসকোর্স ময়দানে। সেদিন সবার সামনে গিয়ে বসেছিলাম আমি আর আমার স্বামী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। মানুষ আর মানুষ, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! অপেক্ষা কখন বঙ্গবন্ধু আসবেন, কী বলবেন। এই অভিজ্ঞতা আমার সারাজীবনের অনন্যস্মৃতি।

অপেক্ষার পালা শেষে তিনি এলেন, কোনোদিকে না তাকিয়ে উঠলেন মঞ্চে। শুনলাম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক। যে অপেক্ষায় আমরা ছিলাম। প্রায় ২৩ মিনিটের ভাষণে তিনি বাঙালির অপমান, নির্যাতন, বঞ্চনার কথা বলে কৌশলে যুদ্ধের ডাক দিলেন। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি সেদিন দেননি। মানুষ সেদিন লাঠি, সড়কি, বৈঠা নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে। মাথার উপরে হেলিকপ্টার ঘুরছে, নিমিষেই শেষ করে দিতে পারে এই জনারণ্যকে। তাঁর ভাষণ শোনার পর বাঙালির তো আর কিছু বোঝাপড়ার প্রয়োজন হয়নি। এরপরই মূলত আমরা রাজনৈতিক কর্মী প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজ করি প্রকাশ্যে পাড়ায় আর রাস্তায়। অন্যদিকে গোপনে চলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ। অপরদিকে অর্থ, ওষুধ, কাপড়, খাবার মজুত করার কাজ চলে। ৭ মার্চের বক্তব্যই ছিল দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার ডাক। তিনি তখন রাষ্ট্রনায়ক নন; কিন্তু তাঁর নির্দেশেই সারাদেশ চলছে। মানুষ তাঁর নির্দেশ মেনে সবকিছু করছে।

আমাদের অনেকেই গোপনে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। মেয়েরা রাইফেল হাতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তেই প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ব্রিগেড তৈরি করা, মানুষকে বোঝানো, সতর্ক করার দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। লাঠি ও টর্চলাইট নিয়ে রাতে পাহারা দিতাম। স্কুল ও কলেজ থেকে বেঞ্চ এনে ব্যারিকেড দিয়েছি। দেশপ্রেম আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা বোধহয় সবকিছুকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। তা না হলে এত ছোটো সন্তানকে রেখে দিনের পর দিন বাইরে থেকেছি কী করে। দেশপ্রেম না থাকলে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে গেলেন কীভাবে? দেশকে ভালোবাসার মতো অন্য কোনো ভালোবাসা হয় না। ব্যক্তিগত প্রেমও সেখানে তুচ্ছ।

যুদ্ধের নয় মাস কোথায় ছিলেন, সেসময়ের লড়াইয়ের স্মৃতি...

মাহফুজা খানম: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে প্রতিদিনের মতো ব্যারিকেড দেওয়ার কাজ করে, যোগাযোগ সেরে সবে ঘরে ফিরেছি। আমার স্বামী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ পল্টন এলাকায় বেশ পরিচিত ব্যক্তি। তাদের পরিবারকেও সবাই জানত। দুজনই ঘরে ফিরেছি। রাত প্রায় সাড়ে ১২টা। রাস্তায় ট্যাংক ও আর্মির গাড়ির গড়গড় শব্দ পাচ্ছি। ছোটো বাচ্চাকে নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত। কিছুক্ষণ পর রাজারবাগে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ। পরপরই ইকবাল হলে মর্টার শেলের শব্দে কান পাতা দায়। আমাদের কাচের জানালা ঝরঝর করে ভাঙছে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেকে নিয়ে আমরা খাটের নিচে শুয়ে পড়ি। এভাবে কাটল কয়েক ঘণ্টা। একবার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি আকাশ লাল হয়ে আছে। যেদিকে তাকাই লালচে আকাশ, আর থেকে থেকে গুলির শব্দ। ভোর হলো একসময়। ২৬ তারিখ কারফিউ। বাসায় কাটাতে হলো, রেডিয়ো খুলে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা আর অস্থিরতায় কাটল। ২৭ মার্চ কারফিউ উঠাল কয়েক ঘণ্টার জন্য। জায়ের দেবরের বউয়ের কাছে

বাচ্চাটাকে রেখে একটা রিকশা করে রওয়ানা হলাম বাবার বাসায় স্বামীবাগে। যেতে যেতে রাস্তায় লাশ পড়ে আছে। সে এক নির্মম দৃশ্য! কোথা থেকে এত সাহস পেয়েছিলাম সেদিন জানি না। এমন মৃত্যুর শহরে মানুষের খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলাম। রাজনৈতিক কর্মী, দেশ গড়ার সৈনিক হিসাবে শপথ নিয়েছি যে, দেশটাকে তো ওদের হাত থেকে যেভাবে হোক স্বাধীন করতে হবে। এই চিন্তাটা মাথায় ছিল। তাই সাহসটা ছিল সঙ্গে। মৃত্যুর কথা ভাবলে তো আমার হবে না!

ইকবাল হল, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঘুরে দেখেছি কে কোথায় কী অবস্থায় আছে। একা একা মধুদার বাড়ি, রোকেয়া হল–সব জায়গা ঘুরছি। এখনো ভাসে আমার ঢাকা শহরটি যেন প্রেতপুরী হয়ে গেছে। পথে পথে লাশ, মানুষের জুতা, স্যান্ডেল। কাঁদছিও না আবার ভয়ও পাচ্ছি না, বোবা প্রাণী হয়ে ঘুরছি আর দেখছি নির্মম দৃশ্যগুলো। ঘণ্টাদুয়েক পর ফিরে আসি। সেদিন থেকে স্বাভাবিক জীবন আর থাকেনি। এরই মধ্যে ২৬ মার্চে রেডিয়োতে হান্নানের পাঠ করা বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণাটা শুনেছি। ২৮ মার্চ থেকেই পার্টির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ও খোঁজখবর শুরু হয়। অনেকে ঢাকার বাইরে চলে গেছে। আমাকে ঢাকায় থেকেই কাজ করার কথা বলা হলো। শুরু হয় অন্যরকম যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে কাজ করার একটা সুবিধা ছিল, আমার শ্বশুরবাড়িটি এদেশের খানদানি সমাজের সুনজরে ছিল। এই বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি হবে, তা চিন্তা করতে পারেনি কেউ। তাছাড়া আমার চার মাসের সন্তান আছে। ধরা পড়ার ভয় ছিল কম। সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। পাশে ছিলেন স্বামী। আমাদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্র আসত। ওই চিঠিগুলো সাইক্লোস্টাইল করতে নিয়ে যেতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আমার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। সেখানে সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল। টেন্সিল কেটে মেশিন ঘুরিয়ে সাইক্লোস্টাইল করতে হতো তখন। সেখানে দায়িত্বে থাকা হীরালাল দা, বিজনদা আমাদের সেই মেশিন ঘরে আটকিয়ে বাইরে তালাবদ্ধ করে এদিক-সেদিক থাকত। সাইক্লোস্টাইল শেষ হলে দরজায় টোকা দিলে তালা খুলে দিত। আবার অনেক সময় এক্সপ্লোসিভ বা বিস্ফোরক তৈরি করতে হতো। ছদ্মবেশ ধরে এভাবে কতদিন কত জায়গায় যে গিয়েছি। নটরডেম কলেজেও গিয়েছি সাইক্লোস্টাইল করতে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষরা সাহায্য করেছে। একবার এমন হলো–আর্মি আসছে খবর পেয়ে পানির বড়ো চিমনির ভেতরে পুলের মধ্যে কাগজপত্র নিয়ে লুকিয়েছিলাম। আরেকবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কেমিক্যাল আনতে গেছি। ওখানে রহমান ভাই নামে একজন ছিলেন, আমি ভেতরে গেলে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিতেন। একদিন ঘরে যাওয়ার পর এক স্যার এসেছেন, ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছেন। কী করি! সাহস করে ওখানে বড়ো চিমনির উপরে উঠে ঘণ্টাখানেক বসেছিলাম। সে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। অনেকে বলেছেন দুঃসাহস, আমার কাছে সেটা মুক্তিযুদ্ধ। দেশপ্রেম। শহিদজননী জাহানারা ইমাম, তিনি আমার বড়ো বোনের ক্লাস ফ্রেন্ড। তাঁর গাড়ি নিয়ে অনেক ধরনের কাজ করেছি। তিনিও আমার সঙ্গে গেছেন। টহলরত আর্মি ও শহরের মুরুব্বি আর পাকিস্তানপন্থিদের নজর এড়িয়ে ছদ্মবেশে কাজ করতে হয়েছে।

পরিবারের অন্যদের কাছে ছেলেকে রেখে বেরিয়ে যেতাম। কী হবে একটুও ভাবার অবকাশ ছিল না। ঢাকায় দুইটি বড়ো অপারেশন কয়েকজন করেছিলাম। তোপখানা রোডে ইউএসএস-এর লাইব্রেরি ছিল। সেখানে বড়ো ধরনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলাম। ফলে লাইব্রেরিটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। আরেকটা সফল অপারেশন করেছি টিভি স্টেশনে। এই খবর কোনোভাবে প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যায়। এর পরপরই আমাদের স্বামীবাগের বাসা থেকে আমার দুই ভাইকে ধরে নিয়ে যায়।

আমাদের বাড়িটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়কেন্দ্র। তখন তো ঘন ঘন কারফিউ থাকত। আলো জ্বালানো যেত না। মোমবাতির আলোয় দরজা-জানালা বন্ধ করে কাজ সারতে হতো। আমাদের বাড়ির বাবুর্চি কাদের বড়ো ডেকচিতে খিচুড়ি আর মাংস রান্না করে সবাইকে খাওয়াত। এমন দিন গেছে একটা ঘরে প্রায় ৩০জন থেকেছি। মাঝে মাঝে অস্ত্র এনে রাখা হতো। সেই অস্ত্র চটের তৈরি বাজারের থলিতে সবজি বা কখনো মাংসের ভেতরে নিচে লুকিয়ে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কেউ আহত হয়ে এলে তাঁকে ঠেলাগাড়িতে তুলে কখনো বউ সেজে বা বোন সেজে কান্নাকাটি করতে করতে নিয়ে যেতাম এলিফ্যান্ট রোডের ডা. আজিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রীর ক্লিনিকে। তাঁরা দুজনই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অনেক সময় রাতে বাসায় থাকিনি। অর্থ, ওষুধ, কাপড় ও শুকনা খাবার সংগ্রহ করে বাবার মতিঝিলের অফিস থেকেই বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম। ধানমন্ডির সুফিয়া কামাল খালার বাসার পেছনেই ছিল রাশিয়ান দূতাবাস, মাঝখানে একটা দেওয়াল। এসব জিনিসপত্র পুঁটলা করে খালার বাসা থেকে ওপাশে ছুড়ে দেওয়া হতো। সেখান থেকে গিয়াস স্যার লুঙ্গি পরে মুটে সেজে এসব নিয়ে যেতেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আরও অনেকেই এই কাজে যুক্ত ছিলেন। নয় মাস কীভাবে কেটেছে, বর্ণনা সহজ নয়। এভাবে কেটেছে পুরো নয় মাস।

এভাবে বিজয়ের দিন আসে। ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেখানে পরাজিত পাকিস্তান সেনারা সারেন্ডার করেছে, পাকিস্তান সেনাপতি সই করেছে, সেটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এই ঘটনার সাক্ষী হওয়াটা আমার জীবনের বড়ো প্রাপ্তি। ওই আনন্দ রাখার তো জায়গা ছিল না। সেদিনের আরেক অভাবনীয় দৃশ্য। এর আগে ইপিআর বাহিনী ওপর থেকে লিফলেট ফেলছে, 'হাতিয়ার ডাল দো' বলা হচ্ছে। এ এক অন্যরকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল সেদিন।

স্মরণীয় ও আনন্দের দৃশ্য মনে পড়ে–পাকিস্তান বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য হাতে অস্ত্র, মাথায় ট্রাংক ও পরনে যুদ্ধাবেশ মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে সারেন্ডারের জায়গাটিতে। দুই পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি, এ যে কী অনুভূতি, তা বলে বোঝানো যাবে না!

দেশ তো স্বাধীন হলো; কিন্তু তখনও জানি না বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না। ঠিক খবর তখনও পাইনি। এভাবে কয়েকটা দিন কেটে গেল, অনিশ্চয়তা আর নানা ধরনের খবরাখবরে কিছুই নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। আমাদের স্বাধীনতার আনন্দ যেন ম্লান হয়ে আছে। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যেদিন বিলেতে ফিরেছেন, সেদিন শুনতে পেলাম খবর, হি ইজ কামিং ব্যাক। সে কী আনন্দ আমাদের! স্বাধীনতার আনন্দ যেন পুরো হলো।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরলেন, সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ে?

মাহফুজা খানম: লন্ডনে আসার দুদিন পর ঢাকায় ফিরলেন তিনি, ১০ মার্চ। ৭ মার্চে যেমন তাঁর ভাষণ শোনার জন্য সব বয়সের সব পেশার মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জড়ো হয়েছিল; তেমনই ১০ জানুয়ারিও সবার গন্তব্য ছিল বিমানবন্দরে। কখন প্লেন নামবে। বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য মানুষ আর মানুষ। আমিও যেতে যেতে মানুষের ভিড় ঠেলে কোথায় যে দাঁড়িয়ে গেছি বলতেই পারি না। বিমানবন্দর পর্যন্ত আর পৌঁছাতেই পারিনি। তবে কাছাকাছিই ছিলাম। এরপর দেখা হয়েছে মার্চে ১৯৭৩ সালে।

আগের বঙ্গবন্ধু এবং পরে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুকে কেমন দেখেছেন...

মাহফুজা খানম: তিনি একই রকম ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। তবে ওনার অনেক ভার ছিল। তাঁর অনেক আক্ষেপ ছিল, আমি শুনেছি, পাকিস্তানিরা সবই নিয়ে গেল চোরগুলোকে রেখে গেছে। রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ মনে করি এজন্য যে, ১৯৭৩ সালে সংবিধান প্রণয়ন/রচনা করলেন গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র–এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে। সমাজতন্ত্রের মূল বিষয়কে তিনি শোষিত ও পরাধীন বাঙালির মুক্তির পথ হিসাবে মনে করেছেন। মানবমুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রের বিকল্প অন্য কোনো কিছু হতে পারে না–এই দর্শন তিনি ধারণ করতেন। দুঃখ হয় একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের মতো শুরু করেও এগোতে পারেননি। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য!

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সংবিধানকেও হত্যা করা হয়েছে? বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

মাহফুজা খানম: মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা তো কেবল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, তাঁর পুরো পরিবারকেও হত্যা করেছে। পৃথিবীতে এমনটা আর নেই! এরপর মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টসহ চার মূল নেতাকে হত্যা করে।

> বঙ্গবন্ধুকে তাঁর সততার মাপকাঠিতে প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে। সব প্রজন্মের কাছেই বঙ্গবন্ধু প্রাসঙ্গিক তাঁর জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম আর সততার জন্য। তাঁর বক্তব্যগুলো, ত্যাগের ইতিহাস, দর্শন ও নির্দেশনাগুলো সামনে আনতে হবে

অবশ্যই বলব যে চার মূলনীতির সংবিধানকেও হত্যা করেছে ওই অশুভ শক্তি, বাংলাদেশের শত্রুরা। ১৯৭৫ সালের পরের ২২ বছর এই দেশটিতে কী হয়েছে, কেমন পরিস্থিতি চলেছে, তা একটু ফিরে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না। আরও কত কী যে পরিবর্তন হয়েছে আর হারিয়েছি, যা পূরণ হওয়ার নয়। এই ক্ষতির মাশুল গুনছি আমরা। ২২ বছর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শোনা যায়নি, তাঁর নাম কেউ উচ্চারণ করতে পারত না। সব ইতিহাস পালটে দেওয়া হয়েছিল। ভুল ইতিহাস পড়ে প্রজন্ম তৈরি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর কোন বিশেষত্ব আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে...

মাহফুজা খানম: যখনই দেখা হতো কী করা দরকার, পরিস্থিতি বিবেচনায় করণীয় বলতেন। সবার সঙ্গে কথা বলতেন, শুনতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ১০ বছর আগে কাউকে দেখেও তা মনে রাখতে পারতেন। নাম ধরে কথা বলতেন। এই ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই থাকে। সবাই ভাবত তাকেই বুঝি বঙ্গবন্ধু খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, ভালোবাসেন। এমন ছিল তাঁর গুণ, যা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্য দেওয়ার মানসিকতা তাঁর মধ্যে দেখেছি। ব্যস্ত সময়েও তিনি কর্মীদের অবহেলা করে কথা বলতেন না। তাতে সব কর্মী তাঁর হয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেত। তিনি খুব ভালো দাবা খেলতেন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। তাঁর বাসায় গিয়ে কেউ না খেয়ে এসেছে–এমনটা শোনা যায় না। বেগম মুজিবের খাবারের ভান্ডার কখনোই যেন বাড়ন্ত থাকেনি আগতদের জন্য। কারণ, তিনি যে বাঙালির নেতা। স্ত্রী রেণুকে গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধুর সবচয়ে বড়ো গুণ ছিল দেশপ্রেম। মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসীম। তা তিনি নিজেও বলতেন। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী মানুষ, নির্লোভ রাজনীতিবিদ। এসবই অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয়। তাঁর মতো এত গুণের নেতা পৃথিবীতে দ্বিতীয়জন নেই। তাঁর সাহস ছিল পাহাড়সমান, যা আমাদের মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে প্রতিনিয়ত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন বছরে এসে আগামী প্রজন্মকে কী বলবেন?

মাহফুজা খানম: বঙ্গবন্ধুকে তাঁর সততার মাপকাঠিতে প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে। সব প্রজন্মের কাছেই বঙ্গবন্ধু প্রাসঙ্গিক তাঁর জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম আর সততার জন্য। তাঁর বক্তব্যগুলো, ত্যাগের ইতিহাস, দর্শন ও নির্দেশনাগুলো সামনে আনতে হবে। বঙ্গবন্ধুর দর্শন আর আদর্শকে সম্মান করতে হলে তিনি যে বাংলাদেশ চেয়েছেন, সেই পথে যেতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে চার মূলনীতির সংবিধান, বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মতাদর্শে ফিরতে হবে। তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে, লেখাপড়া করতে হবে। তাদের বাংলাদেশকে তারা কোথায় নিয়ে যেতে চায়, সেটা দায়িত্ব নিয়ে বুঝে নিতে হবে। তবে এটাও ঠিক যে এই মনোজগৎ তৈরির জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। একটা কথা না বলে পারছি না। '৭৩ সালে কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যে রিপোর্ট দিয়েছিল, তা আজ কোথায়? তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু এখন এই দেশে। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মনোজগতে বাংলাদেশ তো নেই, জাতীয় সংগীত নেই, পতাকা নেই, নেই বাংলাদেশের ঠিকঠাক ইতিহাস। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা বিদেশে চলে যেতে চায় অধিকাংশই। এই শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে জাতির মনোজগৎ তৈরি করা খুব কঠিন কাজ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত বেশি লেখালেখি হবে, বাংলাদেশের জন্ম কীভাবে হলো, কত আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই দেশ পেলাম, তা যত জানবে তরুণরা, ততই দেশের প্রতি তাদের প্রেম ও দায়বদ্ধতা তৈরি হবে। এভাবেই একসময় অবস্থাটা বদলাবে। তাই যে যেখানে আছে বড়োদের উচিত সেই দায়িত্ব পালন করা, ছোটোদের জানানো।

এটা বলতে হয়, অনেক বছর ধরে উলটাধারার সংস্কৃতিতে এদেশের মানুষের মানসিকতা যে জায়গায় চলে গেছে তাতে কোনো উদ্যোগ নিয়ে বাস্তবায়ন করতে গেলে সোজা পথে ও স্বাভাবিক গতিতে করা যাচ্ছে না, ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে যেতে হচ্ছে। শেখ হাসিনাকে সমালোচনা করাই যায়, করেও অনেকে। এটা হচ্ছে না তো ওটা হচ্ছে না। কিন্তু অবস্থাটা তো আর সহজ নেই যে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাড়াতাড়ি সবকিছু ঠিক করে ফেলা সম্ভব। আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই এসব অস্বাভাবিকতা আর নিতে পারি না। ভালো লাগে না। তরুণদের কাছে অনেক প্রত্যাশা, বিশ্বাস করি তারা পারবে এদেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তৈরি করতে, এগিয়ে নিতে।

বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

উপরে উল্লিখিত কথাটি সম্প্রতি বিশ্বনন্দিত নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন হিসাবে পরিচিত লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন শুধু একজন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদই নন, একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি এবং স্বীকৃতি বিশ্বময়। যে লেখাটির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেটিতেও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তির কথাই স্থান পেয়েছে। অমর্ত্য সেন জাতিবর্ণ–নির্বিশেষে সব মানুষের, বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে এক উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। পৃথিবীর সব প্রান্তে অন্যায়, অবিচার, ধর্মান্ধতা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার। সেই অমর্ত্য বাবুর বক্তব্য-মন্তব্য এতই বস্তুনিষ্ঠ যে সব মানুষই তা গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করে থাকেন। অমর্ত্য বাবু বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর থেকে পৃথিবীর সব মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে এবং তিনি পূর্বে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিলেন, আজও তেমনই আছেন, ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবেন। অমর্ত্য বাবুর কথায় বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত পথ হতে পারে সব মানুষের মুক্তির সোপান। একই অনুষ্ঠানে স্বনামধন্য চিন্তাবিদ এবং মুক্তমনের লেখক ও গবেষক অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাধারণ মানুষ, তথা কৃষক-শ্রমিকের কণ্ঠস্বর।

এ দুই মহামনীষীর ভাষণ থেকে বঙ্গবন্ধুর পরিচয়, পরিচিতি এবং বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে ফুটে উঠেছে সর্বত্র। জানা গেছে, অনুষ্ঠানে লন্ডন স্কুল অব

ইকোনমিকসের প্রভাষক, শিক্ষার্থীরা ছাড়াও প্রচুর শ্রোতার উপস্থিতি ছিল এবং অমর্ত্য সেন ও রেহমান সোবহানের ভাষণ বেশ ঘটা করেই প্রচারিত হয়েছে বিলেতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমে।

বিশ্বমানবতার পক্ষে সোচ্চার হয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বেশকিছু মনীষী চিরঞ্জীব হয়েছেন। গত এক হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় এই তালিকায় যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে রয়েছেন মহামতি অতীশ দীপঙ্কর, কার্ল মার্কস, ভ্লাদিমির লেনিন, লিও টলস্টয়, আব্রাহাম লিংকন, কামাল আতাতুর্ক, পাবলো নেরুদা, মাও সেতুং, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভেরা, মার্টিন লুথার কিং, সালভাদর আলেন্দে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন শাহ, মাদার তেরেসা, বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্নার্ড শ, নেলসন ম্যান্ডেলা, অঁদ্রে মালরো, ইয়াসির আরাফাত, আহমেদ সুকর্ন, হো চি মিন–সবাই বিশ্বমানবতার জন্য, হানাহানি বন্ধের জন্য, নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন কণ্ঠসৈনিক হিসাবে, কলমসৈনিক হিসাবে–এমনকি সশস্ত্র সৈনিক হিসাবেও। এই তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে নাম থাকবে আমাদেরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাকে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বিশ্ববন্ধু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে এক ঋষিতুল্য মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র সম্মেলনে (UNCLOS-III) এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে সমুদ্রের তলদেশে যে অমূল্য সম্পদ রয়েছে, এর মালিক সারা পৃথিবীর মানুষ। একে বলা হয়েছে, 'হ্যারিটেজ অব ম্যানকাইন্ড', অর্থাৎ মানবসম্পদ

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁরা জেনেছেন শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অন্য দশজন থেকে আলাদা। তাঁর প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান, অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা তখন থেকেই পরিলক্ষিত। সেই ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন। বিশ্বের সব প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীই শৈশব থেকেই অন্যের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। প্রকৃতিই তাঁদের আলাদা করে তৈরি করেছে, ক্ষণজন্মা হিসাবে।

বঙ্গবন্ধু নিজেই সব সময় বলতেন তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি একজন মানুষ আর সে হিসাবে তিনি পৃথিবীর সব মানুষের কথা, বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষের কথা ভাবেন। তিনি সোচ্চার ছিলেন ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোর মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, এমনকি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মানুষের শোষণ-মুক্তির আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানাতেন। জাতিসংঘের প্রথম ভাষণেই তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত যথা–শোষিত এবং শোষকদের মধ্যে। তিনি শোষিতের পক্ষে। অন্যান্য বিশ্বসভা যথা কমনওয়েলথ সম্মেলন, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, ওআইসিতেও তিনি সব নিপীড়িত মানুষের দাবিকেই প্রাধান্য দিতেন। আর তাই তো অঁদ্রে মালরো, উইলি ব্রান্ট, শ্যোন ম্যাকব্রাইট, ফিদেল কাস্ত্রো, ইয়াসির আরাফাত, নায়ারেয়ার, জোসেফ টিটো, সাদ্দাম হোসেন, ইন্দিরা গান্ধী, কাউন্ডা, ডেজমন্ড টিটো প্রমুখের মতো সমসাময়িক বিশ্বনেতারা বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচনা করতেন।

ব্যক্তিজীবনে ধর্মভীরু হলেও ধর্মান্ধতাকে তিনি ঘৃণা করতেন, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের বিরুদ্ধে তাঁর মতো প্রতিবাদী লোকের সংখ্যা পৃথিবীতেই কম। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কথা ছিল, পৃথিবীর সব মানুষই একই স্রষ্টার সৃষ্টি আর স্রষ্টা হলেন সব মানুষের প্রভু, শুধু মুসলমানদের প্রভু নন। তিনি ওআইসি সম্মেলনে গেলেও তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িক নীতি থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কামাল আতাতুর্কও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত পাশ্চাত্যের সংজ্ঞা পরিহার করে বঙ্গবন্ধু এই মর্মে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সব ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনে সমান অধিকার, যে তত্ত্ব আজ বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বঙ্গবন্ধু সুদীপ্ত কণ্ঠে পৃথিবীর সব সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর জোর দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি দাবি করতেন প্রকৃতি যে সম্পদ দিয়েছে, এর মালিক বিশ্বের সব মানুষ, তাই এগুলোকে একচ্ছত্রভাবে ভোগ করার অধিকার কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা সংস্থার নেই। তাঁর এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র সম্মেলনে (UNCLOS-III) এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে সমুদ্রের তলদেশে যে অমূল্য সম্পদ রয়েছে, এর মালিক সারা পৃথিবীর মানুষ। একে বলা হয়েছে, 'হ্যারিটেজ অব ম্যানকাইন্ড', অর্থাৎ মানবসম্পদ। বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু সম্মেলনে বিশ্বনন্দিত নেতারা বঙ্গবন্ধুকে কখনো বার্ট্রান্ড রাসেল, কখনো অঁদ্রে মালরোর মতো মানবপ্রেমী দার্শনিকের সঙ্গে তুলনা করা হতো। সেদিন অমর্ত্য সেন যে বলিষ্ঠতা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববন্ধু বলেছিলেন, একইভাবে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর সেসময়ের বিশ্ব কাঁপানো নেতা যথা: ফিদেল কাস্ত্রো, ইন্দিরা গান্ধী, উইলি ব্রান্ট, জোসেফ টিটো, সাদ্দাম হোসেন, শ্যোন ম্যাকব্রাইট বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের নেতা হিসাবে উল্লেখ করতে ভোলেননি। অনেকেই সেদিন বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর বিদায় সারাবিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বঙ্গবন্ধুকে কৃষক-শ্রমিক এবং মেহনতি মানুষের নেতা বলে যে কথা বলেছেন, তার নিরঙ্কুশ প্রমাণ মেলে ভারত বিভাগের আগ দিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিরীক্ষণ করলে। ১৯৪০ সালে চার্চিলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সময় যখন লাখ লাখ বঙ্গসন্তান অনাহারে মারা যাচ্ছিল, তখন সেসময়ের বাংলার বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ওপর অনাহারক্লিষ্ট বাঙালিদের মুখে খাবার জোগানোর জন্য যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালের বঙ্গবন্ধু। দেশভাগের পরপরই তিনি বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের নানাবিধ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় নেমে পড়েছিলেন। আজ

অনেকেই হয়তো ভুলে গেছেন যে পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে সেসময়ের এশিয়ার বৃহত্তর পাটকল আদমজী জুট মিলের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পাকিস্তানি নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে একসময় সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতোই বহু শ্রমিকের ওপর পাকিস্তানি পুলিশ-সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল পূর্বসতর্ক উচ্চারণ না করে। বঙ্গবন্ধু সেসময়ে ঘরে বসে থাকতে পারেননি, নেমে পড়েছিলেন মহাসড়কে, হত্যার ভয় দেখিয়েও কেউ তার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেনি। ব্রিটিশ রাজের অস্তগমনের পরও সাদা ব্রিটিশদের কালো মানুষ নামে পরিচিত জমিদারদের এবং মহাজনদের অত্যাচারের মাত্রা তখনও কমেনি। এদের অত্যাচার বন্ধের জন্য জমিদারি উচ্ছেদের দাবি নিয়ে যারা এগিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁদের অন্যতম। পাকিস্তানি শাসক এবং ধনকুবেরদের অত্যাচার বন্ধের জন্য তিনি সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এবং মওলানা ভাসানীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগকে চিরতরে বাংলার মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সব অর্থেই ছিলেন এদেশের সাধারণ মাটির মানুষের, অর্থাৎ ভূমিসন্তানদের নিকটতম ব্যক্তি। রাজনীতিতে আভিজাত্যবাদ ভেঙে তিনিই প্রথম সাধারণ মানুষের দরজায় রাজনীতি পৌঁছে দিয়েছিলেন। শেরেবাংলা ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীও রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আনার চেষ্টারত ছিলেন বৈকি; কিন্তু তাঁরা সে উদ্দেশ্যে ততদূর এগোতে পারেননি, যা সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর দ্বারা। তাঁর দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, আত্মত্যাগের স্পৃহা এবং অসাধারণ বাগ্মিতা এবং সম্মোহনী শক্তির দ্বারাই অন্যেরা যা করতে পারেননি, বঙ্গবন্ধু সেই অসাধ্য সাধনই করতে পেরেছিলেন।

১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুই খুলনার কৃষকদের দাওয়াল আন্দোলনের (কৃষি কর্মীদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কৃষিপণ্য নেওয়ার অধিকারের) সমর্থনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত বিভাগের আগে তিনি রাজনীতিতে আভিজাত্যবাদের শেকড় তুলে ফেলার জন্য নবাব পরিবারের খাজা নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করেছিলেন। আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন রূপ দেওয়ার জন্য দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বর্জনের জন্য সাফল্যের সঙ্গে চাপ দিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তখনকার সময়ে বাংলার বেসামরিক সরবরাহমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে চাপ দিয়েছিলেন অন্যান্য এলাকা থেকে খাদ্য আমদানি এবং জরুরি ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে খাদ্য উৎপাদনের জন্য। তিনি সেসময় সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার লাঘব করার।

জমিদার প্রথা বিলুপ্তির জন্য আইন প্রণয়নে তাঁর দাবি ছিল অত্যন্ত সরব, যার ফলে জমিদারি উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। তিনি ১৯৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হতভাগা ভুক্তভোগীদের সহায়তায়, সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসার দাবিতে। তার সারাজীবনের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ মানুষ, যে কারণে তিনি পেয়েছিলেন অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, যা এই উপমহাদেশের অন্য কারও পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছিলেন, শেখ মুজিব তাঁর (ইন্দিরার) চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। তাঁর গণমুখী এবং গণহিতৈষী রাজনীতির কারণেই ১৯৭১-এর ৭ মার্চ তাঁর জনসভায় নিজেদের জীবনবাজি রেখে এত লোক যোগ দিয়েছিলেন, যা ছিল অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গকারী। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে এবং তাঁকে একনজর দেখতে যত জনসমাগম হয়েছিল, কলকাতার ইতিহাসে এর আগে তা কখনো হয়নি। তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশা ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি বাকশাল সৃষ্টি করেছিলেন সংশ্লিষ্ট সব মানুষকে একত্রিত করে। বাকশাল করার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত বা দলীয় কোনো ফায়দা ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বড়ো বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের অর্থনীতিতে উচ্চবিত্তদের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। একই উদ্দেশ্যে তিনি ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছিলেন এবং সরকারি খাসজমি ভূমিহীনদের ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রচলন করেছিলেন। সাধারণ জেলেরা যাতে মহাজনদের দ্বারা শোষিত হতে না পারে, এজন্য 'জাল যার জলা তার' নীতির প্রবক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু, যে নীতি অনুযায়ী সরকারি জলমহালের ইজারা জেলেদের দেওয়ার নীতি প্রবর্তিত হয়।

আজ যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গৃহহীন জনগণকে ঘর তৈরি করে দিচ্ছেন, সে ইচ্ছা কিন্তু বঙ্গবন্ধুই প্রথম ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হত্যাকারীরা বঙ্গবন্ধুকে তা করতে দেয়নি। তিনি সব মানুষের মধ্যে গণশিক্ষা প্রচলনের জন্য ড. কুদরত-ই-খোদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেই ক্ষান্ত হননি, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে যে কথাগুলো সন্নিবিষ্ট করেছেন, এর দ্বিতীয় শীর্ষস্থানেই রয়েছে শোষণমুক্তির কথা। আরও রয়েছে উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা, বণ্টনপ্রণালিগুলোর জনগণভিত্তিক মালিকানা। মূলনীতিতে তিনি কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির কথা বলেছেন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছেন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছেন, জনস্বাস্থ্যের কথা বলেছেন। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা চিকিৎসাব্যবস্থা এবং চিকিৎসাশিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দেশে-বিদেশে তাঁর সব বক্তৃতায় প্রাধান্য পেত কৃষক-শ্রমিকদের কথা। অমর্ত্য সেন আরও বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসৃত হলে শ্রীলঙ্কায় রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ হতো না। তিনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ধারণ করতেন, তা বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু সারাবিশ্বে পরিবর্তনের আলো দেখিয়েছিলেন বলেই তিনি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন পৌঁছলে তাঁকে ব্রিটিশ প্রটোকলের সব বিধিবিধান ভঙ্গ করে যে সম্মাননা দেখানো হয়েছিল, তা অতীতে কাউকে দেখানো হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতেও দেখানো হবে না। তিনি যখন জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে গিয়েছিলেন, তখন সেই সম্মেলনের সব অগ্নিপুরুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য। তাঁকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তির জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ, কসেগিন, উইলি ব্রান্ট, শ্যোন ম্যাকব্রাইট, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম, মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, অ্যামনেস্টি প্রধান মার্টিন এনালস, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট প্রধান ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দসহ ব্রিটিশ এবং অন্য বহুদেশের শক্তিধর সংসদ সদস্যরা।

সারা পৃথিবীর কাছে তাঁর পরিচিতি বিশ্বের সব অঞ্চলের নির্যাতিত মানুষের মুখপাত্র হিসাবে। ইতিহাসে তিনি সেই পরিচয় নিয়েই অমর হয়ে থাকবেন, যার প্রমাণ ৪৫ বছর পরও অমর্ত্য সেনের মতো একজন বিশিষ্ট নোবেল বিজয়ীর মুখে বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম প্রশংসা। বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষ যুগে যুগে জন্মায় না, এরপরও পৃথিবীকে শোষণমুক্ত, অন্যায়মুক্ত, নির্যাতনমুক্ত, অবিচারমুক্ত করে সব মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে উন্মুক্ত রাখার জন্য যুগে যুগে বঙ্গবন্ধুসম মহামানবের জন্ম হোক—এটাই আজ মানবজাতির প্রত্যাশা।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

মহানায়ক হয়ে ওঠার মহাকাব্য

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

দক্ষিণ বাংলার এক অজপাড়াগাঁ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া। বছরের বেশির ভাগ সময় পানিতে ডুবে থাকে। তবে ফসলের মাঠ, গাছগাছালির স্নিগ্ধ পরিবেশে টুঙ্গিপাড়া গ্রামের আড়াই শ বছরের প্রাচীন শেখবাড়িতে বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা শেখ সায়েরা খাতুনের কোল আলো করে যে শিশুর জন্ম হলো, তাঁর নাম খোকা বা শেখ মুজিবুর রহমান। তখন ঔপনিবেশিক তাণ্ডব। মানুষের জন্য বুকজুড়ে ভালোবাসা আর কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে তাঁর বেড়ে ওঠা। সেই কণ্ঠই একদিন বাংলার আকাশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের অধিকার চাই' এই উচ্চারণে। তিনি তখন বঙ্গবন্ধু, বাঙালির প্রাণপুরুষ। অবিসংবাদিত নেতা। কালো মানুষের নেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন: 'I have a dream'. কিং তাঁর স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারেননি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্ন অর্থাৎ, স্বজাতির অধিকার আদায়ে, বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে ঠিকই সফল হয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ওই কালরাত্রিতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে উপস্থিত পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হলো, মিলিটারি জান্তার শাসন আনা হলো; কিন্তু তাঁর সোনার বাংলা ও বাঙালি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ম্লান করা যায়নি। শত প্রতিকূলতা এমনকি কোভিডের ভয়াল থাবাও স্বপ্ন পূরণের পথে বাধা হতে পারেনি। তাঁর কন্যা বর্তমান বিশ্বের সৎসাহসী, সফল রাষ্ট্রনেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন-পুনর্বাসন কাজ সমাপ্ত করে 'অনুন্নত বাংলাদেশ'কে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করেন। ৪৮ বছর পর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ উন্নয়নশীল (developing) দেশের কাতারে উপনীত করলেন। পিতা দিলেন স্বাধীনতা, কন্যা আনলেন স্বাবলম্বিতা। বঙ্গবন্ধু রচিত এগিয়ে যাওয়ার ভিতগুলো হলো:

* গণতন্ত্র।
* জাতীয়তাবাদ।
* সমাজতন্ত্র।
* ধর্মনিরপেক্ষতা।
* বাংলাদেশের সংবিধান রচনা (মাত্র ৯ মাসে)।
* মুজিব-ইন্দিরা আলোচনায় মাত্র তিন মাসে মিত্রশক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতে ফেরত পাঠানো।
* মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের অবসান ও চুক্তি সম্পাদন।
* কৃষিকে আধুনিকায়ন।
* শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়ন।
* যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
* সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।
* রাজাকার, আলবদর তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে ৩৭ হাজার গ্রেফতার। ১১ হাজারের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান এবং দেশের প্রতিটি মহকুমা জেলায় ৭৪টি যুদ্ধাপরাধী বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন। কয়েকজনের শাস্তি ।
* মুক্তিযুদ্ধকালীন উদাহরণ থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা। এতে জামায়াত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে দেশ থেকে মদ, জুয়া, রেস নিষিদ্ধ করে একটি আধুনিক বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করেন।
* দেশব্যাপী অবকাঠামো উন্নয়ন।
* নিজস্ব অর্থে প্রাইড প্রকল্প পদ্মা সেতু নির্মাণ।
* চট্টগ্রামে কর্ণফুলি টানেল।
* ঢাকার মেট্রোরেল।
* প্রাইড প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।
* পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর।
* তিস্তা ব্যারাজ নির্মাণ।
* আকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট
* প্রথম প্রাইভেট টিভি চ্যানেল একুশে টিভি থেকে অর্ধশতাধিক টেলিভিশন।
* বিশ্বের ১৩০টির মতো দেশ যেখানে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন জোগাড় করতে পারেনি, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ক্যারিশমা এবং দেশের ইমেজের কারণে সবার আগে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন সংগ্রহ ও ইঞ্জেকশন আকারে প্রদান শুরু।
* আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইটি বিজ্ঞানী পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। এই ডিজিটালাইজেশনের সুযোগে কেউ কেউ ভুয়া লেখক হচ্ছে, টিভি টকশোতে শেখ হাসিনার কট্টর সমালোচনা করছে। কখনো কখনো ফেসবুক-টুইটারে বা টকশোতে বা মানববন্ধনে নির্লজ্জ ভাষা ব্যবহার করছে। তবু শেখ হাসিনা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, রাষ্ট্রের জন্য হুমকিমূলক হলে ভিন্ন কথা।

"স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন-পুনর্বাসন কাজ সমাপ্ত করে 'অনুন্নত বাংলাদেশ'কে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করেন"

জাতির পিতা রচিত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের বিস্ময়। একসময় যে বাংলাদেশকে বলা হতো ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মঙ্গা-দুর্ভিক্ষের দেশ, আজ সেই বাংলাদেশই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে:

* খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ। একটি মানুষও না খেয়ে থাকে না। এমনকি করোনার ভয়াবহতা শুরু হলে ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।
* মানুষের মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলার ছাড়িয়েছে।
* ছেলেমেয়েরা ইউনিফর্ম বা জিন্স-কেডস পরে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে।
* খালি পায়ে কেউ হাঁটে না।
* বছরের প্রথম দিনে ৩৫ কোটি পাঠ্যবই বাচ্চাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।
* জাতীয় বাজেট ৬ লাখ কোটি টাকা।
* মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়াতে বাড়াতে আগামী বাজেটে মাসে ২০,০০০ টাকা ও পাঁচটি বোনাস।
* ঘরহীন মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর করে দেওয়া হচ্ছে।
* বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মিলিটারি জিয়া:

১. মদ, জুয়া, হাউজি, রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। আবার চালু হয় মদ-জুয়া হাউজি এবং যাত্রার নামে লাকি খানের নোংরা ড্যান্স।
২. যুদ্ধাপরাধী জামায়াত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাদের প্রকাশ্য রাজনীতিতে আনেন।
৩. যুদ্ধাপরাধী নেতা গোলাম আজমকে পাকিস্তান থেকে দেশে এনে তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার তারসহ অনেকের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছিলেন।
৪. সাজাপ্রাপ্ত এবং চার্জশিটভুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন।
৫. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত ৭৪টি বিচার ট্রাইব্যুনাল ভেঙে দেন।

৬. বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশের দূতাবাসে উচ্চপদে চাকরিদানসহ খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকেন।
৭. বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সংবিধানকে কেটেছেঁটে ক্ষতবিক্ষত করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে আবার পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ধারায় নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

সর্বোপরি মিলিটারি জিয়া তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চারিতার্থ করার জন্য 'I will make politics difficult for the politicians' বলে মুসলিম লীগ, জামায়াত, রাজাকার, ভাসানী-ন্যাপের রাজাকার অংশ এবং বিএনপি নামে এক জগাখিচুড়ি ও দক্ষিণপন্থি দল গঠন করে দেশের রাজনীতিকে ডিফিকাল্ট করে দেন। Money is no problem বলে পলিটিশিয়ান কেনাবেচা করেন। সামরিক শাসক এরশাদ এবং খালেদা জিয়াউর রহমানের প্রণীত পথে চলে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে ২৬টি বছর নিয়ে নেয়, অপচয় করে। এখান থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে ২০২১—এই ১৭ বছরে দেশকে আবার অগ্রগতির ধারায় নিয়ে আসেন। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল কাতারে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু দেশকে অনুন্নত থেকে স্বল্পোন্নত ধারায় নিয়ে আসেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ২৬টি বছর ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয়। মিলিটারি জিয়া-এরশাদ-খালেদা রেজিমই ব্যর্থতার কাল। মির্জা ফখরুল যতই 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাতে চান, কোনো লাভ হবে না। মানুষ অন্ধ নন, তাদের মতো দেশবিরোধীও নন। মানুষ দেখছে:

১. বিশ্বের ১৩০টি দেশ যেখানে এখনো ভ্যাকসিন পায়নি, সেখানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভ্যাকসিন আনে এবং গত ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ফ্রি ভ্যাকসিন দিতে শুরু করেছেন।
২. মির্জা ফখরুল আকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বা সমুদ্রতলদেশের ফাইবার অপটিক ক্যাবল না হয় দেখছেন না; কিন্তু পদ্মা সেতু, গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, চট্টগ্রামের কর্ণফুলি টানেল নিশ্চয়ই দেখছেন।
৩. নিশ্চয়ই দেখছেন মানুষ খেয়ে-পরে আছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো; গরিব-দুঃখী মানুষ, বিধবা ও বয়স্ক মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ভাতা পাচ্ছেন, মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে দুই হাজার ডলার ছাড়িয়েছে, করোনার মধ্যে জিডিপি কমছে না, ডিজিটাইজেশন এসব ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই দেখছেন।
৪. এসব দেখেশুনেই হয়তো এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি নিয়েছে। খবর ভালো তবে একটা কিন্তু আছে। জিয়ার ড্রামতত্ত্বসহ মিথ্যার হাঁড়িগুলো আবার সামনে আনা।
৫. বস্তুত শেখ হাসিনা রাষ্ট্র নেতৃত্বকে এমন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তার আশেপাশে দাঁড়ানো দূরের কথা, শত শত মাইল দূরে পড়ে আছেন। পা-ও ছুঁতে পারছে না। তাদের নেতা কে? খালেদা, আর শক্তি নেই। তারেক, হাওয়া ভবন-খোয়াব ভবনই চালাতে পারবে, দল রাষ্ট্র নয়।
৬. শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে যাবে।

অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলার বুক থেকে ২১ বছর (১৯৭৫-১৯৯৬) কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর আবার ২০০১-২০০৬ পাঁচ বছর। নইলে বহু আগেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশের কাতারে উঠে আসত। ওই ২৬টি বছর ছিল মিলিটারি শাসনের যুগ এবং মিলিটারি শাসন কোনো দেশকে উন্নত করেছে—এমন নজির নেই। জিয়া-এরশাদের মতো সামরিক জান্তারা বাংলাদেশকে ২১ বছর পেছনে নিয়ে গেলেন। তবুও সেই প্রবাদবাক্যের মতো বলতে হয়: 'better late then never.'

আজকের এই অগ্রগতির ভিত রচনা করে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর স্লোগান হলো: 'বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই'।

এই বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জীবন মাত্র ৫৫ বছরের। এতেই তিনি রাষ্ট্র-রাজনীতির যে মহাকাব্য রচনা করেছেন এবং তা-ই বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃত। এজন্য যে বাঙালি হাজার বছর পর্যন্ত লড়াই করেছে; কিন্তু নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। হাজি শরীয়ত উল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রানী ভবানী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, আলাওল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ক্ষুদিরাম, তারও আগে চর্যাপদের যুগের বিপ্লবী কবিরা লড়াই করেছেন, জীবন দিয়েছেন; কিন্তু স্বাধীনতা আনতে পারেননি। খিলাফত আন্দোলন, সিপাহিবিদ্রোহ, সন্যাসবিদ্রোহ, গাজীর বিদ্রোহ—হাজার বছর ধরে এমনই হাজার লড়াই-সংগ্রাম, বিদ্রোহ হয়েছে; কিন্তু স্বাধীনতা আসেনি। সম্ভবত ওইসব লড়াই-সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন নেতৃত্বহীন বা দুর্বল নেতৃত্বে ছিল বলেই। প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই-সংগ্রামগুলো একই মোহনায় প্রবাহিত করিয়ে উচ্চারণ করলেন:

* 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'
* 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

এইভাবে জয় বাংলা বলে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরল, বাংলাদেশ স্বাধীন করল।

আর সেই কারণেই জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত মুজিববর্ষের কর্মসূচি অনুধাবন করতে হবে। কোভিড-১৯ বা করোনা আমাদের অনেক কিছু থামিয়ে দিয়েছে, গতি মন্থর করেছে, তবু শেখ হাসিনার কালজয়ী নেতৃত্ব আমাদের সামনে আছে। পৃথিবীর যেখানে ১৩০টির মতো দেশ এখনো কোভিড ভ্যাকসিন সংগ্রহ করতে পারেনি, সেখানে বাংলাদেশ ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বিনামূল্যে জনগণকে টিকা দিয়ে চলেছে। এটি সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া পথে হাঁটছেন বলেই। রাজনৈতিক ক্যারিশমা তো রয়েছেই। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে তাঁর নিজের লেখা:

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী (Unfinished autobiography)
২. কারাগারের রোজনামচা (Jail Diary)
৩. দেখে এলাম নয়াচীন
এবং একই সঙ্গে
১. Secret documents of intelligence branch on father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
২. Speeches of Sheikh Mujibur Rahman in Pakistan Parliament পড়তে হবে।

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান যৌবনে ২টি উপদেশ দিয়েছিলেন:
১. লেখাপড়া করতে হবে।
২. Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর নোটবুক থেকে জানা যায়:
'As a man, what concern mankind concerns me. As a Bangalee, I am deeply involved in all that concerns bangalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, endevering love, which gives meaning to my politics and to my very being'

Sheikh Mujibur Rahman
30-05-73

অর্থাৎ, একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা-ই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:
What is the mystery of your charismatic leadership?
−I love my people
What is the weakness of your leadership?
−I love them too much.
বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রোর মূল্যায়ন ছিল: 'আমি হিমালয় দেখিনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখেছি।'

এছাড়াও রয়েছে: ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ঐতিহাসিক ছয় দফা, ঐতিহাসিক ১১ দফা, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কালজয়ী বক্তৃতা (যা আজ বিশ্ব ঐতিহ্যভুক্ত), ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকি-আর্মি জান্তাকর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার আগমুহূর্তে রাত সাড়ে ১২টায় স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (The diclaration of independence) দেন, যা তৎকালীন ইপিআর (বিজিবি)-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করা হয়।

ঘোষণাটি ছিল: This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I called upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মুজিবনগরে (কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত প্রকাশিত স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ইশতাহার বা ঘোষণাপত্র ও ১৭ এপ্রিল একই জায়গায় প্রবাসী বিপ্লবী সরকারের শপথগ্রহণ।

বাংলাদেশের সংবিধান

এখানে একটি কথা বলা দরকার, পাকিস্তানের ২৪ বছরে বঙ্গবন্ধু তাঁর লড়াই-সংগ্রাম, বক্তৃতা-বিবৃতিতেই আমাদের সংবিধান রচনার উপকরণ দিতে থাকেন, যে কারণে সংবিধানটি হয়ে ওঠে সর্বজনীন এবং জন-অধিকারের রক্ষাকবচ।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে (জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত) শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। গণপরিষদে বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণ।

এইসব দলিল পড়লে অনেক প্রশ্নেরই সমাধান হয়ে যাবে। দোদিল বান্দারাও ঠিক হয়ে যাবে। যেমন, স্বাধীনতার ইশতাহার এমন দলিল, যা পড়লে যারা এক মিলিটারি সেপাইকে (যাকে ২৭ মার্চ ১৯৭১-এর আগে চিনত না, নামও শোনেনি) স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে চায়, তারা ঠিক হয়ে যাবে। ইশতাহারে বলা আছে:

"যেহেতু বাংলাদেশ ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ হইতে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

এবং

"যেহেতু ওই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জনের মধ্যে ১৬৭ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেন যারা আওয়ামী লীগের সদস্য

এবং

"যেহেতু ক্ষমতা হস্তান্তর না করে মিলিটারি ইয়াহিয়া জান্তা একটি অনৈতিক যুদ্ধ শুরু এবং গণহত্যা এবং নজিরবিহীন নির্যাতন শুরু করে

এখানে একটি কথা বলা দরকার, পাকিস্তানের ২৪ বছরে বঙ্গবন্ধু তাঁর লড়াই-সংগ্রাম, বক্তৃতা-বিবৃতিতেই আমাদের সংবিধান রচনার উপকরণ দিতে থাকেন, যে কারণে সংবিধানটি হয়ে ওঠে সর্বজনীন এবং জন-অধিকারের রক্ষাকবচ

এবং

"যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের ক্ষমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমরা গণপরিষদের সদস্যগণ ঘোষণা করতেছি যে, বাংলাদেশ হইবে সার্বভৌম জনগণের প্রজাতন্ত্র এবং এতদ্বারা ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিশ্চিত করিতেছি...

এবং

"এতদ্বারা নিশ্চিত করতেছি যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন

এবং

"আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্রের চার মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন,

"ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা কৃষ্টি যা-ই বলা হোক এর সাথে একটি জিনিস রয়েছে তা হলো 'অনুভূতি'।

"বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম লড়াই মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন এবং এই অর্জনের একটা ভিত্তি আছে তা হলো 'অনুভূতি' এবং এই 'অনুভূতি' আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ।"

দ্বিতীয়ত: গণতন্ত্র

'আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র। দেখা গেছে অনেক দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রটেকশন দেয়। তাই আমরা সবকিছু জাতীয়করণ করেছি যাতে গণতন্ত্র শোষিতের স্বার্থ রক্ষা করে।'

তৃতীয়ত: সমাজতন্ত্র

'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ।'

চতুর্থত: ধর্ম নিরপেক্ষতা

'ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারও বাধা দেবার অধিকার থাকবে না। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে কারও বাধা দেবার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আপত্তি হলো ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। যদি কেউ বলে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব বরং সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, শোষণ, বেইমানি, খুন, ব্যভিচার এই বাংলার মাটিতে চালানো হয়েছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।' যে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ মহাকালের ইতিহাসের মহানায়ক।

দেশে বিএনপি নামে একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে, যেটির প্রতিষ্ঠাতা মিলিটারি জিয়াউর রহমান। কাগজে দেখলাম তারা নাকি এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে। এটি ভালো হতো যদি তাদের purpose এ sincerity and honesty থাকত। আমি মনে করি, তাদের এই সুবর্ণজয়ন্তী পালনের পেছনে মতলব আছে, যার কিছু কিছু আলামত এরই মধ্যে সামনে চলে এসেছে:

১. মিলিটারি জিয়ার ড্রামতত্ত্ব।
২. আওয়ামী লীগ শরণার্থী মুক্তিযোদ্ধা? তারা যুদ্ধ করেনি।
৩. বিএনপি দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছে।
৪. বিএনপিতে নাকি অনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে!

এসব ভুয়া তথ্যগুলো প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই হবে তাদের সুবর্ণজয়ন্তী পালন। একই সঙ্গে মাঠে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তির মহড়া প্রদান, যার কিছু নমুনা দেখা গেছে সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে। ওরা নাকি ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিবস উদ্‌যাপন করবে। এক্ষেত্রে তারা যে কাজটি করবে, তা হলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মূল্যায়ন করবে ঠিক; কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাকে আড়াল করে মিলিটারি জিয়ার ড্রামতত্ত্ব সামনে আনা।

সর্বশেষ যে কথাটি বলব তা হচ্ছে–পাকিস্তানের প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যত রিপোর্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছে, এর সবই ছিল বঙ্গবন্ধুকে টার্গেট করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত declassified documents (১৯৪৮ থেকে ১৯৭১), যার শিরোনাম: Secret documents of intelligence branch on father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. প্রতিটি পাতার প্যারায় প্যারায় কেবল বঙ্গবন্ধুর কথা। একটিই নাম, একজনই মানুষ–টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান।

দীর্ঘদিন অনেক চেষ্টা করা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে খাটো করে দেখানোর। Secret document তারই মোক্ষম জবাব। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুনুর রশিদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু গ্রন্থও আরেকটি কড়া জবাব। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসটি বাঙালির ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১ মার্চ মিলিটারি ইয়াহিয়া যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বন্ধ করেছিলেন, তখন তার হুমকি ছিল: 'Mujib is a traitor, this time he will not go unpunished'. তিনি কিন্তু অন্য কোনো নেতা বা মেজরকে হুমকি দেননি।

একটি কথা দিয়ে শেষ করতে চাই–বিএনপি জানে তারা মিথ্যা বানোয়াট কথা বলছে, মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে, তারপরও তারা গোয়েবলসের থিওরি অনুযায়ী বারবার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। কিন্তু গোয়েবলস যে মরে ভূত হয়ে গেছে, ফখরুল সাহেবদের বোধকরি সেই খবর নেই। এসবেরই জবাব Secret documents, বঙ্গবন্ধুর লেখা তিনটি গ্রন্থ এবং মুক্তিযুদ্ধের ওপর শত-সহস্র গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় এবং মিডিয়া কলাম। গোয়েবলসনামার দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

লেখক: সংসদ সদস্য; সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

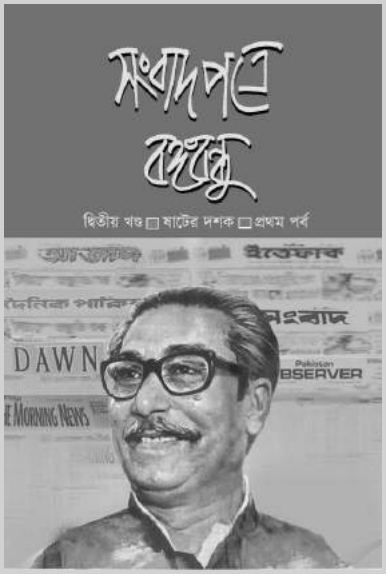

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তাঁকে দাবায়ে রাখা যায়নি

অজয় দাশগুপ্ত

শেখ মুজিব এমন এক ব্যক্তি, যাকে ভয় ছুঁতে পারে না। যদি আপনি একশব্দে শেখ মুজিবকে প্রকাশ করতে চান, তাহলে আপনাকে বেছে নিতে হবে 'সাহসী' শব্দটা–'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের জন্ম' গ্রন্থে এ কথা লিখেছেন কাজী আহমেদ কামাল। (পৃ. ১৭-১৮)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী আহমেদ কামাল দুজন গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শুরুতে কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন এবং বেকার হোস্টেলে একসঙ্গে কাটিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা গেছে যে কোনো ব্যক্তি জনগণের জন্য এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য কোনো প্রোগ্রাম দিয়েছে, যাহা ন্যায্য বলে জনগণ মেনে নিয়েছে। অত্যাচার করে তাহা দমন করা যায় না। যদি সেই ব্যক্তিকে হত্যাও করা যায় কিন্তু দাবি মরে না এবং সে দাবি আদায়ও হয়। যারা ইতিহাসের ছাত্র বা রাজনীতিবিদ, তারা ভালো করে জানেন। জেলের ভেতর আমি মরে পারি যেতে তবে এ বিশ্বাস নিয়ে মরব। জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার একদিন আদায় করবে।' (পৃ. ২৩৯)

'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে এ কথা লিখেছেন তিনি ১৯৬৭ সালের ৩ মে থেকে ২৩ মের মধ্যে। তখন স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি দেওয়ার কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু তিনি নিরুদ্‌বিগ্ন। বই ও পত্রিকা পড়ছেন। লিখছেন। ফুলচাষ করছেন। ফলের গাছের যত্ন নিচ্ছেন। কারাগারের আশপাশে যেসব ছাত্রবন্দি আছে, তারা খিচুড়ি খেতে চায়। সে আয়োজন করছেন। স্ত্রী ও আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগে রাজনৈতিক নির্দেশনা পাঠাচ্ছেন সহকর্মীদের কাছে।

কৈশোর থেকেই তিনি তেজস্বী, দৃঢ়চেতা, অভীষ্টসাধনে কৃতসংকল্প। ক্যারিশমা তো ছিলই। ১৯৩৮ সালে, বয়স যখন ১৮ বছর–বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহকুমা শহর গোপালগঞ্জে এলে তিনি নির্ভীকচিত্তে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিদ্যালয়ের সমস্যা তুলে ধরেন, আদায় করেন দাবি। এ সফরের সময়েই ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠনের বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই সরাসরি যোগাযোগ, চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও চলতে থাকে। এই বয়সেই তাঁর প্রথম জেলজীবনের অভিজ্ঞতা ঘটে। কিন্তু কিছুতেই তিনি দমে যাননি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং একই সঙ্গে জনকল্যাণ–এই লক্ষ্য নির্ধারণের পাশাপাশি তিনি কলেজে পড়াশোনার জন্য যান কলকাতা, ১৯৪২ সালে ভর্তি হন ইসলামিয়া কলেজে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাঁকে আমরা দেখি ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা পরিচালনার কাজে। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে তিনি শান্তি স্থাপনের পাশাপাশি সক্রিয় রিলিফ ক্যাম্প পরিচালনায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাসখানেকের মধ্যেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন, ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে।

‘ফজলুল কাদের চৌধুরী ৯ মে (১৯৪৯) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের ছাত্র ও মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে শেখ মুজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন

সেই বয়সেই বুঝতে সমস্যা হয়নি যে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দমিয়ে রাখতে সক্রিয়। এজন্য মিথ্যাচার এবং ধর্মের অপব্যবহার করতেও তাদের দ্বিধা নেই। তিনি এ অন্যায় রুখে দাঁড়াতে উদ্যোগী হলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাড়ে চার মাসের মধ্যে গড়ে তোলেন সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার–ছাত্রলীগ। এর দেড় বছরের কম সময়ের মধ্যে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি নির্বাচিত করে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগেরও তিনি প্রাণপুরুষ।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগ মাত্র দুই মাস সাতদিনের মাথায় নেতৃত্ব দেয় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ডাকা ১১ মার্চের হরতালে। এদিন বিপুলসংখ্যক ছাত্র, নেতাকর্মীর সঙ্গে গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল পাকিস্তান আমলে তাঁর প্রায় ১৩ বছর জেলজীবনের প্রথম।

পাকিস্তানে তাঁর দ্বিতীয় জেল ১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের আন্দোলন সমর্থন করলে ২৭ জন ছাত্রছাত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানায়, সদাচরণের বন্ড ও আর্থিক জরিমানা দিলে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু তরুণ মুজিব অদম্য। তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর স্থান হয় কারাগারে। এই কারাগারেই তাঁর কাছে হাজির হন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কলকাতায় ছাত্র আন্দোলন করার সময় যার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’-এর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, ‘ফজলুল কাদের চৌধুরী ৯ মে (১৯৪৯) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের ছাত্র ও মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে শেখ মুজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ক্ষমা চাইতেও রাজি হননি। তাঁর মতে, ছাত্ররা এমন কোনো অন্যায় করেনি যেজন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তারপরও ফজলুল কাদের চৌধুরী আপসের জন্য পীড়াপীড়ি করলে শেখ মুজিব চারটি শর্ত উপস্থাপন করেন–সব ছাত্রছাত্রীর শাস্তি প্রত্যাহার, এ ঘটনায় আটক সব ছাত্রের মুক্তি, নতুন করে কারও বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া এবং সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করায় তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু জীবনের যে পাঠ তিনি গ্রহণ করেছেন মাতৃভূমির প্রতি, জনগণের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ থেকে, সেটাই তাঁকে সংকল্পবদ্ধ করে তোলে। তিনি শপথ নেন–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ছাত্র হিসাবে না হলেও আমি আবার ফিরে আসব।’

কী দূরদর্শীই না ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ‘ষড়যন্ত্র’ করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়। এ মামলা বাতিল ও অন্যান্য দাবিতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি যে প্রবল ছাত্র গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে, এর নেতৃত্বে ছিল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নির্বাচিত সংগঠন ডাকসু তাঁকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁর আহ্বানে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

এভাবেই জাতির পিতার গৌরবময় ফিরে আসা!

কেমন অদম্য, দুঃসাহসী তিনি? ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন–আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর ১১ অক্টোবর (১৯৪৯) ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা ও পরে মিছিল করার ‘অপরাধে’ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। এ সময়েই দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নির্দেশ দেন–পাকিস্তানের লাহোর যাও। কী করে সেখানে যাওয়া যাবে? যেতে হবে ভারতের ওপর দিয়ে, যেখানে তখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। অর্থের ব্যবস্থাই বা কীভাবে হবে? অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এসব প্রশ্নে ‘ভাসানী সাহেব বললেন, তা আমি কি জানি! যেভাবে পার লাহোর যাও। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে দেখা কর এবং তাঁকে সকল কিছু বল।’ (পৃ. ১৩৫)

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি লাহোর গেছেন ১৫ অক্টোবর রাতে। ফিরেছেন এক মাসের বেশি সময় পর, নভেম্বরের শেষদিকে। গ্রেফতার হন ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এরপর একটানা দুই বছর দুই মাস কাটে কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে। কিন্তু তিনি তো আগের মতোই ন্যায়ের জন্য দুর্দমনীয়, আপসহীন।

এই জেলজীবনের বেশির ভাগ কাটে নিরাপত্তা বন্দি হিসাবে। তিন বা ছয় মাসের আটকাদেশ প্রদান করে বিনা বিচারে রাখা হচ্ছিল পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। সেসময়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শামসুল

হকসহ কয়েকজন নেতাকেও কারাগারে কাটাতে হয়। কিন্তু তাঁর মতো একটানা দুই বছরের বেশি কারাজীবন কয়েকজন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে দেখা যায়নি। এই বন্দিজীবনেই কিছুদিন পর পর গোয়েন্দারা কারাগারে দেখা করত এবং ফিরে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দিত–'এ বন্দিকে কোনোভাবেই বাগ মানানো যায় না, নত করানো যায় না। অতএব, আটকাদেশ বাড়ানো হোক।'

১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর গ্রেফতারের দিন শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে গোয়েন্দা নোটে বলা হয়, 'তিনি হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সবচেয়ে মিলিট্যান্ট সদস্য এবং ছাত্রদের একটি অংশের মধ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।' (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৮)

১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারির ডিআইবি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ক্ষতি বা অনিষ্ঠ সাধনে সে খুবই দক্ষ। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাকে ৬ মাস আটক রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা অপরিহার্য।' (পৃ. ৩৫৪)

এ বছরের ২৬ মে বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে জেপু নামে একজনকে চিঠি লিখেছেন–"তুমি আমাকে বন্ড দিতে বলেছ। আমি বুঝতে পারি না কেমন করে তুমি আমার কাছে 'বন্ড' শব্দটি লিখতে সাহস পেলে। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করতে জানি না।" (পৃ. ৪৩৯)

৩০ বছর বয়সে নির্জন কারা প্রকোষ্ঠ থেকে যখন তিনি এ দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেন, প্রিয়তম স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব তখন দুঃখ-কষ্টের জীবন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে, সঙ্গে তিন বছরের মেয়ে শেখ হাসিনা ও এক বছরের ছেলে শেখ কামাল।

এ বছরেরই ১৪ জুন এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়–'১ জুন ও ১০ জুন দুজন গোয়েন্দা অফিসার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁর মনোভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। এমনকি বন্ড দিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভে তিনি ইচ্ছুক নন।' (পৃ. ৪৪৮)

১৬ জুন আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শর্ত মেনে মুক্তিলাভের চেয়ে তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে থাকা এবং মৃত্যুবরণকেও শ্রেয় মনে করেন।' (পৃ. ৪৫১)

এমন দুঃসাহস ও আত্মপ্রত্যয় সেই যৌবনেই দেখিয়েছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১১ জুলাই (১৯৫০) এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কারাগারে কয়েকজন আত্মীয়সহ বড়ো বোন আসিয়া বেগম দেখা করেছেন। পারিবারিক বিষয়ে আলোচনার একপর্যায়ে তাঁকে বন্ড দিয়ে মুক্তিলাভের পরামর্শ দিলে তিনি সেটা করতে অস্বীকৃতি জানান।

২৭ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯ সেপ্টেম্বর একজন পুলিশ অফিসার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। ১২ সেপ্টেম্বর এক মামলায় তাঁর তিন মাস সশ্রম জেল হয়েছে। বিচারক বলেছেন, 'এ মামলায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হককে খালাস দেওয়া হলো। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান মিছিলে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেননি, বরং তিনি গুলির মুখে দাঁড়াতে সংকল্প ব্যক্ত করেন। তাকে শর্তহীনভাবে ও অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বে মুক্তি দিলে ঝামেলা পাকাবে।'

কীভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হতেন? মনোবল দৃঢ় রাখতেন? এর উত্তর মিলবে বঙ্গবন্ধুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে, যা ১৯৫১ সালে আইএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া এক শিক্ষার্থী টুঙ্গিপাড়া থেকে লিখেছেন ১৯৫০ সালের ৬ অক্টোবর। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের ৫১০-৫১১ পৃষ্ঠায় চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে গ্রামের 'খোকার' জন্য গর্ব, উচ্ছ্বাস। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'কতদিন কারাগারে বন্দি থাকবেন জানি না। কত কষ্ট সহ্য করতে হবে আপনাকে। কিন্তু আদর্শের জন্য আপনার আত্মত্যাগ দেশের কৃষক ও দরিদ্র মানুষ স্মরণ রাখবে।'

৫ অক্টোবর ফরিদপুর কারাগারে থাকার সময় এক গোয়েন্দা অফিসার সাক্ষাৎ করেন। তাকে বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দিয়েছেন, জেলে মরব তবু বন্ড দেব না। মুক্ত হলে রাজনীতি করব।

আমরা ধরে নিতে পারি, বারবার তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল, যা তিনি অসম্মানজনক বিবেচনা করেছেন। তাঁকে বলা হচ্ছিল–চাকরি করুন কিংবা ব্যবসায়ে যোগ দিন। সরকারি দলে যোগ দিলে লাইসেন্স-পারমিট পেতে সমস্যা নেই। সংসারের প্রতি মনোযোগ দিন। স্ত্রী-কন্যা-পুত্রকে সময় দিন।

কিন্তু জনগণের কল্যাণে কাজ করাই তাঁর কাছে রাজনীতি। এটা তিনি কীভাবে ত্যাগ করবেন?

২১ ডিসেম্বর (১৯৫০) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ফরিদপুর জেল থেকে চিঠিতে বঙ্গবন্ধু লেখেন, 'মামলা কতদিন চলবে জানি না, আমি পরোয়া করি না।...আমি জানি যারা কোনো আদর্শেও জন্য উৎসর্গীকৃত থাকে তারা কমই পরাজিত হয়। মহৎ লক্ষ্য মহৎ আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।...গত অক্টোবরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাক্ষাতের সময় আপনি কয়েকটি বই পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখনো কোনো বই পাই নাই। ভুলে যাবেন না আমি নির্জন কারাগারে রয়েছি এবং বই-ই আমার একমাত্র সঙ্গী।'

কেন তিনি অদম্য, বুঝতে সমস্যা হয় না আমাদের।

১৯৫১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান খুলনা জেলে আটক রয়েছেন। ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি নিশ্চিত, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরাজিত করবে। ডিটেনশনে আটক থেকে মৃত্যু হলেও তিনি বন্ড দিতে রাজি নন। তাঁর মনোভাব অনমনীয়।

১৯ সেপ্টেম্বও (১৯৫১) বঙ্গবন্ধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হক সাহেবকে (সম্ভবত আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক) লিখেছেন, 'ভয়ের কারণ নেই। আমি জানি, আমি মরতে পারি না, বহু কাজ আমাকে করতে হবে। খোদা যাহাকে না মারে মানুষ তাহাকে মারতে পারে না। নানা কারণে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার কোন কিছুর দরকার নাই। যদি ২/১ খানা ভালো ইতিহাস অথবা গল্পের বই পাঠাতে পারেন তবে খুশি হব।'

এ বছরেরই ১২ নভেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাবেক অফিসার আকতার আহাদ করাচি থেকে বঙ্গবন্ধুকে লিখেছেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব সব সময় আপনার প্রশংসা করেন। গত সপ্তাহে তিনি এক কর্মিসভায় বলেছেন, 'মুজিবুর রহমানের মতো ৫ জন থাকলে গোটা দেশ তাঁর পাশে থাকত।'

১৯৫১ সালের শেষদিকে বন্দি থাকার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সে সময়টি নতুন করে ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। হাসপাতালে থাকার সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন কর্মসূচি সফল করার বিষয়ে। ১ জানুয়ারি (১৯৫২) এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, নিরাপত্তি বন্দি মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য ঢাকায় দেওয়া চিকিৎসা সুবিধার অপব্যবহার করছেন।

এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কে কে দেখা করেছেন, কী আলোচনা হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে। বিস্ময়ের যে, গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বিবরণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর বিবরণ হুবহু মিলে যায়। অথচ বঙ্গবন্ধু এ গ্রন্থ রচনা করেন ১৯৬৭ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার সময়। আর গোয়েন্দা প্রতিবেদন দশকের পর দশক চাপা পড়ে ছিল পুলিশের হেফাজতখানায়, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তা প্রকাশ শুরু করেছেন।

গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে আমরা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ডাকা হরতাল কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী মহিউদ্দিন আহমদের অনশন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত জানতে পারি। ফরিদপুর জেলে অনশনের সময় তাঁদের প্রাণসংশয় হয়েছিল। কিন্তু উভয়ে ছিলেন অদম্য। সালাম-বরকত-রফিকের আত্মদানে ২১ ফেব্রুয়ারির অমরগাথা রচিত হওয়ার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে মুসলিম লীগ সরকার বাধ্য হয়। মুক্তি দেওয়া হলেও ১ মার্চ (১৯৫২) সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়–'তাঁর ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে এবং যদি তিনি বেআইনি কাজে লিপ্ত থাকেন তাকে গ্রেফতার করতে হবে।'

টানা দুই বছরের বেশি জেলজীবন, অনশনের দুঃসহ শারীরিক কষ্ট। এর মধ্যেই মুক্তিলাভের ঠিক দুমাস পর ২৬ এপ্রিল তাঁর হাতে অর্পিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব। এ সময়ে দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে জেলে নেওয়া হয়। জেলে যাওয়ার আগে ১২ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি লেখেন, 'পূর্ব্ব বাংলার ৪।। কোটী মজলুমের সহায় একমাত্র আল্লাহ্ আর তোমরা কতিপয় যুবক ছাড়া আর কেহ নাই।' (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৯)

তৃতীয় সন্তান শেখ জামালের জন্মের খবর পেয়ে তিনি লিখেছেন, 'স্নেহের রেণু। আজ খবর পেলাম তোমার একটি ছেলে হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ। খুব ব্যস্ত, একটু পরে ট্রেনে উঠব। ইতি তোমার মুজিব।'

পূর্ব বাংলায় তখন মুসলিম লীগের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। জনগণ আস্থা রাখতে শুরু করেছে আওয়ামী মুসলিম লীগের ওপর। দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এ সুযোগ পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান। তিনি জেলা-মহকুমায় ব্যাপকভাবে সংগঠনিক সফর করতে থাকেন। গোয়েন্দা তাঁর পেছনে সর্বক্ষণ লেগে থাকছিল। সিনেমা দেখতে কিংবা সেলুনে গেলেও তারা সঙ্গী! ওয়াচারদের ওপর কঠোর নির্দেশ–তাঁর গতিবিধির প্রতিমুহূর্তেও বিবরণ পাঠাতে হবে।

জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা যে পুলিশ সদর দপ্তরের সহায়তায় এসব গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনের তৃতীয় খণ্ড থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ও আতাউর রহমান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৫-২০ হাজার ছাত্রজনতার মিছিলের নেতৃত্ব দেন। আরমানিটোলা ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পূর্ব বাংলার প্রতিটি মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। (পৃ. ৮৭-৮৮)

এ সময়ে বঙ্গবন্ধু দলকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে ৫ মে স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবকে লেখা চিঠিতে। তৃতীয় সন্তান শেখ জামালের জন্মের খবর পেয়ে তিনি লিখেছেন, 'স্নেহের রেণু। আজ খবর পেলাম তোমার একটি ছেলে হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ। খুব ব্যস্ত, একটু পরে ট্রেনে উঠব। ইতি তোমার মুজিব।'

গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি, বঙ্গবন্ধু পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের জনসভায় যোগদানের জন্য ট্রেনে উঠেছিলেন। সেসময়ে ফুলবাড়িয়ায় ছিল কেন্দ্রীয় রেলস্টেশন।

এমন অতুলন আত্মত্যাগ!

তিনি নিরলস শ্রম-সাধনায় দলকে প্রস্তুত করেছিলেন ১৯৫৪ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনের জন্য। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কারণে বাঙালিদের জন্য আরেক দফা বিপর্যয় নেমে আসে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু বিস্ময়ের যে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানকেই গ্রেফতার করা হয়, যিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাদের জানা ছিল, দলের নেতাকর্মী ও জনগণকে প্রতিবাদমুখর করে তোলার মতো সাহসী ব্যক্তি এই একজনই রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে দুঃখ করে লিখেছেন, 'অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।' (পৃ. ২৭৩)

আগের জেলজীবনের সঙ্গে পার্থক্য ছিল–তিনি সদ্যবিদায়ি মন্ত্রিসভার সদস্য। বহাল রয়েছেন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার নির্বাচিত সদস্য হিসাবে। বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক। বয়স মাত্রই ৩৪ বছর। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবে পরিবর্তন নেই। ৯ জুলাই (১৯৫৪) তারিখ ডিআইবির অতিরিক্ত এসপি এস রহমান লিখেছেন, 'এই ব্যক্তি সবচেয়ে ভয়ানক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের একজন এবং রাষ্ট্রে ঝঞ্ঝাট ও ক্ষতিসাধনে পারঙ্গম। সক্ষমতা ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য ৬ মাস বিনা বিচারে আটক রাখা অপরিহার্য এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে এ সুপারিশ করছি।'

১৯ অক্টোবর এক গোয়েন্দা অফিসার দেখা করে সেই 'গৎবাঁধা' মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর মনোভাব দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। তিনি শর্তাধীন মুক্তির বিরুদ্ধে। হি ইজ এ গ্রেট ট্রাবলশুটার।' (চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৯)

১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জানুয়ারি (১৯৫৫) মওলানা ভাসানী হামিদাবাদ, গোয়ালপাড়া, আসাম (তখন তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন) থেকে বঙ্গবন্ধুকে চিঠি লেখেন–'আশা করি জনগণ তোমার মতো নির্ভীক কর্মীদের কারণে উপকৃত হবে।' (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২২)

মুক্তিলাভের পর ফের তিনি জনতার দরবারে। এ সময়ে নিরলসভাবে কাজ করেন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনের লক্ষ্য সামনে রেখে। ১৯৫৫ সালের ৫ মে ময়মনসিংহ টাউন হলের জনসভায় তিনি বলেন, ৯২-ক ধারা জারি করে ৫০ জন আইনসভা সদস্যসহ আওয়ামী লীগের ১৫ শ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। মোহাম্মদ আলী সাহেব ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক বলে গালি দেন। তিনি আমাদের জেলে পাঠাতে পারেন। কিন্তু আমরা অদম্য। আমরা জেলে পচে মরব না, আমরা আত্মসমর্পণ করব না। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭)

১৮ জুলাই, ১৯৫৫ আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে এক চিঠিতে লেখেন, 'সত্যিই আপনার জন্য আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি...এবং কামনা করছি একদিন যেন দেশ আপনাকে নিয়ে গর্ব্ব করতে পারে।'

কী চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী!

১৯৫৬ সালের প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য আমদানির দাবি জানায়। ৯ মে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা আমরণ সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট নতিস্বীকার করিব না।' তিনি স্লোগান তোলেন–'সস্তা দরে চাউল চাই, সর্বত্র রেশনিং চাই।' ১২ জুলাই করাচিতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ক্ষমতাসীন চক্র পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় একটি কলোনির মতো করিয়া রাখিয়াছে।'

খাদ্য সংকট সমাধানের দাবিতে আওয়ামী লীগ হরতাল-মিছিলসহ একের পর এক কর্মসূচি প্রদান করতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভুখা মিছিল বের হয়। ৪ সেপ্টেম্বর এ ধরনের মিছিলে গুলি হয়। ৫ সেপ্টেম্বর হরতাল পালিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা, পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। বঙ্গবন্ধু স্থান পান মন্ত্রিসভায়। কিন্তু দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রিত্ব ও দলের পদের একটি বেছে নিতে আহ্বান জানালে তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়েন। সর্বক্ষণ সময় দেন দলের কাজে। ১৯৫৭ সালের ৩১ মে তিনি পদত্যাগ করেন, যদিও তা গৃহীত হয় দুই মাস ৮ দিন পর, ৮ আগস্ট। পদত্যাগপত্র বিবেচনাধীন থাকার সময়েই দলের সভাপতি জনপ্রিয় নেতা মওলানা ভাসানী বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। এই দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু গোটা পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়ান দলকে ধরে রাখার জন্য। এতে সুফল মেলে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর বাঙালিদের ওপর শোষণ-বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নিপীড়ন নতুন মাত্রা লাভ করে। কিন্তু দল সুসংগঠিত এবং বিশেষভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিপুল প্রভাব থাকায় দ্রুতই তিনি সামরিক জান্তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।

১৯৫৮ সালের ২৫ জুলাই মর্নিং নিউজ পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার প্রচার করে। ওই সময়ে পাকিস্তান ও ইরানকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টা চলছিল। বঙ্গবন্ধুর কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট উত্তর দেন–'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ চক্রান্ত প্রতিহত করবেই। এটা হচ্ছে পাকিস্তানে বাঙালিদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার আরেকটি হীন পরিকল্পনা।' (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৯)

৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি হয়। বঙ্গবন্ধু সেদিন ছিলেন রাজধানী করাচিতে। পরদিন তিনি ঢাকা চলে আসেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ১০ অক্টোবর। জেলার, ১২ অক্টোবর গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন, 'এ বন্দিকে মোটেই বিচলিত মনে হয়নি। তিনি অন্য বন্দিদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, সামরিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না এবং রাজবন্দিরা সকলে আবার জনগণের কাছে ফিরে যাবে।'

বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একসময়ের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সব সদস্যের কাছে একটি আবেদন প্রকাশ করেছিলেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের পঞ্চম খণ্ডের ৪৬-৪৯ পৃষ্ঠায় এটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে তারিখ দেওয়া রয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। সেসময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি ছিলেন। আবুল হাশিম লিখেছেন, 'ব্রেভেস্ট অব দ্য ব্রেভ অব দ্য ক্রুসেডারস অব পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগের প্রথম শ্রেণির কর্মী শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বিনা বিচারে আটক রয়েছেন।'

কলকাতায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় আবুল হাশিমের সংস্পর্শে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তরুণ এ কর্মীর সম্ভাবনা তিনি যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেন। পাকিস্তান শুরুর পর মুসলিম লীগকে যারা কোটারি বা পকেট সংগঠনে পরিণত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর একসময়ের সহকর্মীর সংগ্রাম হচ্ছে পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা। পরবর্তী জীবনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে সেভাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

১৯৫৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু তাকে বলেন, ২০ বছর রাজনীতি করছি। দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করছি। পরিবার ও সন্তানদের অবহেলা করেছি। কিন্তু সামরিক শাসন জারির পর দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। তিনি হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মুক্তি পেলে মানিক ভাইকে বলব, ইত্তেফাকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ দিতে। লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ারও চেষ্টা করতে পারি। এর কোনোটি না হলে ব্যবসা শুরু করতে পারি। এমনকি চায়ের দোকানও দিতে পারি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চালু হতে পারে। আইয়ুব খান নির্বাচন দেবেন না। গণভোট হবে। দেশবাসীকে কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার সুযোগ দেওয়া হবে। (পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৯৭-১৯৮)

কী নির্ভুল উচ্চারণ, কী অপার দূরদৃষ্টি!

১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি এক গোয়েন্দা অফিসার কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। বরাবরের মতো তাঁকে বন্ড দিয়ে মুক্তিলাভের প্রস্তাব দেওয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের মনোভাব আগের চেয়ে নমনীয়, এটা উল্লেখ করে গোয়েন্দার সেই একই বয়ান–রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনজীবনে শান্তির জন্য তাঁকে আরও ৬ মাস আটক রাখার সুপারিশ করছি।

২৮ মার্চ (১৯৫৯) বন্দিদের মামলা পর্যালোচনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি আইনবহির্ভূত কাজে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমান সময়ে মুক্তির সুপারিশ ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তাঁকে আটক রাখা হউক। (পৃ. ৩২৪)

৭ এপ্রিল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ. খালেক লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বাস করা যায় না। রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে তাঁর সক্ষমতা উচ্চমাত্রায় এবং মুক্তি দিলে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির মামলা তদন্তে সমস্যা হবে। এ কারণে আরও ৬ মাস আটক রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৯ সালের ৩ জুন ঢাকার সদর মহকুমা হাকিমের আদালত থেকে দুর্নীতির মামলায় অব্যাহতি পেয়েছিলেন। রায়ে বলা হয়, দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাঁর বিরুদ্ধে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি।

মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেলেও বঙ্গবন্ধুকে সামরিক শাসকরা বিনা বিচারে আটক রাখে।

৭ আগস্ট এক গোয়েন্দা অফিসার কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবারও বন্ড দিয়ে মুক্তির প্রস্তাব করেন। উত্তরে তিনি বলেন, বন্ড দেব না। ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে জনস্বার্থে আরও ৬ মাসের জন্য আটক রাখার সুপারিশ করা হয়। উপদেষ্টা বোর্ডও একই সুপারিশ করে।

১৯৫৯ সালের ১০ ডিসেম্বর ঢাকার একটি আদালত বঙ্গবন্ধুকে চিটিং করার অভিযোগের মামলা থেকে মুক্তি দেন। ১৭ ডিসেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। তবে তাঁর চলাচল ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ বহুবিধ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তজীবন ও রাজনৈতিক হয়রানি পাশাপাশি চলে। একের পর এক মিথ্যা মামলা চলতে থাকে। ১৯৬০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাঁকে এক মামলায় দুই বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানার দণ্ড দেওয়া হয়। ২২ সেপ্টেম্বর তিনি জামিনে মুক্ত হন।

এ সময় তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষকে ধোঁকা দিতে আলফা ইনসিউরেন্সে চাকরি নেন। বর্তমান গুলিস্তান এলাকায় তাঁর অফিসটি হয়ে

ওঠে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মিলনকেন্দ্র। ১৯৬২ সালের শুরুতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে, এর পেছনে প্রেরণা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ জেলজীবন স্থায়ী হয় চার মাসের মতো। জেল থেকে মুক্ত হয়েই তিনি সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে আরও ৮ জন নেতার সঙ্গে যৌথভাবে বিবৃতি প্রদান করেন। 'নয় নেতার বিবৃতি' পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরতে পারে। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে শিক্ষা বিষয়ে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে প্রবল ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৭ সেপ্টেম্বর পালিত হয় হরতাল। আইয়ুব খান ছাত্রদের দাবি মেনে পিছু হটতে বাধ্য হন।

বঙ্গবন্ধুকে দমিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাকে সর্বক্ষণ তোষামোদ করে চলা গভর্নর মোনেম খানের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনপ্রিয় মুখ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব–এ মনোভাব তিনি নানা পর্যায়ে ব্যক্ত করতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রদান করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি। স্বায়ত্তশাসনের এ দাবি আদায়ে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও দক্ষিণপন্থি রাজনৈতিক শক্তি। বঙ্গবন্ধু এ কর্মসূচি উপস্থাপনের জন্য বেছে নেন লাহোর নগরীকে, যেখানে ২৬ বছর আগে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক পাকিস্তান গঠনের জন্য উত্থাপন করেছিলেন লাহোর প্রস্তাব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যথার্থভাবেই বলছেন যে এক বাঙালি পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব তোলেন লাহোরে, আরেক বাঙালি সেই লাহোরকেই বেছে নেন পাকিস্তান ভাঙার কর্মসূচি উপস্থাপনের জন্য। শত্রুর ডেরায় শত্রুকে চ্যালেঞ্জ জানানো–এমনটি কেবল বঙ্গবন্ধুই করতে পেরেছেন। ছয় দফা পেশের দেড় মাসের মাথায় ১৬ মার্চ রাজশাহীতে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, শেখ মুজিবের কর্মসূচির লক্ষ্য অখণ্ড বাংলা কায়েম। এ দাবি প্রতিরোধ আমাদের দায়িত্ব। পাকিস্তান শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এর দাঁতভাঙা জবাব আসে ২০ মার্চ। ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু বলেন, ছয় দফা আমাদের অস্তিত্বের দাবি। নির্যাতন হবে। কারাগারে নেবে। কিন্তু ক্ষান্ত দিলে চলবে না। পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন, পাকিস্তানে দুই অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে। একই দিনে আইয়ুব খান ঢাকায় মুসলিম লীগ নেতাদের সম্মেলনে গৃহযুদ্ধের হুমকি দেন।

এটা যে কথার কথা ছিল না, অচিরেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যে প্রতিরক্ষা আইন ও জরুরি অবস্থা জারি করা হয়, সেটাই প্রয়োগ করা হতে থাকে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু অদম্য শেখ মুজিব কোনো বাধা মানেননি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তাঁকে ফাঁসিতে হত্যার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি রেখে চলতে থাকে প্রহসনের মামলা। এ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ও বন্দিশালার রুমমেট মেজর শামসুল আলম এ লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে একদিনের জন্যও হতাশ-হতোদ্যম হতে দেখিনি। রুমে কিংবা আদালতে যাওয়ার পথে এবং আদালতের ভেতরে তিনি ছিলেন নির্ভয়। সবাইকে উৎসাহ দিতেন। বলতেন ছাত্র-জনতার আন্দোলন গড়ে উঠবে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং সবাইকে তারা মুক্ত করবেই।

বাস্তবে এটাই ঘটেছিল। জনগণ ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু হিসাবে বরণ করে নেয়। মামলা চলাকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট লাহোরে রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে এ বৈঠকে অংশগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি নিঃশর্তভাবে মামলা প্রত্যাহার ও সব বন্দির মুক্তির দাবিতে অটল ছিলেন এবং তা আদায় করে ছাড়েন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি অটল–ছয় দফার প্রশ্নে আপস নেই। ১৯৭১ সালে তিনি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর সময় লাখ লাখ মানুষকে সাক্ষী রেখে বলেন, 'যদি কেউ ছয় দফার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে জ্যান্ত কবর দেবেন।'

এই অদম্য মনোভাব নিয়েই তিনি ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার মুখোমুখি হন। ইয়াহিয়া খান-টিক্কা খানের হুমকি উপেক্ষা করেই পরিচালনা করেন বিকল্প সরকার। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ধ্বনিত হয় তাঁর অবিস্মরণীয় আহ্বান–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ সমাবেশেই তাঁর অবিনাশী উচ্চারণ–'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

বাস্তবেই সেটা পারেনি। ২৫ মার্চ মধ্য রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় 'শত্রুরাষ্ট্র' পাকিস্তানে। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা যেমন চলে, তেমনই 'আপস প্রস্তাব' দেওয়াও অসম্ভব নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য খন্দকার মোশতাক আহমেদের ষড়যন্ত্রের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ছিল, পাকিস্তানও ছিল। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন ভূখণ্ডের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিবেদিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বরাবরের মতোই ছিলেন সংকল্পবদ্ধ। তাঁর নামেই পরিচালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিনাশর্তে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে–নিঃসঙ্গ বন্দিজীবনে এসব জানার সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু ১৯৭২ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মুক্তির বিষয়ে পাকিস্তানের শাসকরা যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসে, সবকিছু যেন ছবির মতো ভেসে থাকে চোখের সামনে। স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি ফিরে আসেন ১০ জানুয়ারি, লাখ লাখ মানুষের সংবর্ধনায় সিক্ত হয়ে।

তাঁর শক্তির উৎস কী–এ প্রশ্নে বারবার তিনি বলেছেন, জনগণের ভালোবাসা। এই ভালোবাসার ওপরেই গভীর আস্থা রেখে তিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকটি উপেক্ষা করেন। ঘাতকরা যখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে হত্যার জন্য ভয়ংকর স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র তাক করে, তখনও তিনি নির্ভীক, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিল্লুর রহমান খান 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন, উদ্যত ঘাতকদের বঙ্গবন্ধু বলেন–'যদি বাঙালিরা তাদের জাতির পিতাকে হত্যা করতে চায়, তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু এর পরিণতি বাঙালিদের জন্য শুভ হবে না। তাদের জীবন কখনোই আগের মতো হবে না এবং তাঁকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রকেও তারা হত্যা করবে এবং মানবিকতা বিদায় নেবে।' (পৃ. ২৬১)

কী অমোঘ সত্য ধ্বনিত হয়েছিল জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে!

বাংলাদেশের আত্মপ্রত্যয়ী জনগণ ঘুরে দাঁড়ায়। তারা গণতন্ত্রের জন্য আত্মদান করে। একাত্তরের চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য সক্রিয় হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সোনার বাংলা কায়েমের জন্য রাজপথে নামে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন ও দণ্ড কার্যকর করে।

বঙ্গবন্ধুকে যেমন দমিয়ে রাখা যায়নি, তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের জনগণকেও যে দমিয়ে রাখা যায় না!

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১
জানুয়ারি থেকে মার্চের
জন্ম-জয়রথে

রেজা সেলিম

সত্তর সালে পাকিস্তানের শেষ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়েও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা চলছিল ভুট্টো ও পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সম্মিলিত কূটচালে। এই সময়ে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক পরিণত নেতৃত্ব শক্তিতে আবির্ভূত হন। আজকের দিনে সেসব তথ্য ও ঘটনাবলির সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পর্যালোচনা করলে অবিশ্বাস্য নেতৃত্বের আধিকারী বঙ্গবন্ধুর যে পরিচয় আমরা পাই, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। উপমহাদেশের রাজনীতিতে এমন শক্তিধর নেতার আর দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই, যিনি সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি দেশের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব করায়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই এই শক্তিধর মানুষটির পরিচয় পেয়েছিল পাকিস্তান সরকার থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবী–এমনকি সুদূর মার্কিন মুল্লুকের পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতিনির্ধারক পাকিস্তানগুরু হেনরি কিসিঞ্জারও।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রেসকোর্স ময়দানে একটি বিরল ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ২৬৮ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ছয় দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের সংকল্প ঘোষণা করে শপথ গ্রহণ করেন। ৪ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এই তথ্য জানিয়ে লিখেছে, 'সম্ভবতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরনের গণশপথ গ্রহণ এই প্রথম।' ইত্তেফাক আরও লিখেছে, 'শেখ মুজিবের ডানপার্শ্বে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ এবং বামপার্শ্বে

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দাঁড়াইয়া শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের বাম হাতে শপথনামা এবং ডান হাত শপথের ভঙ্গিতে উদিত ছিল। নেতার সঙ্গে সঙ্গে সকল সদস্য শপথনামা পাঠ করেন। শপথ পাঠ করার পূর্বে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের সামনে জনসাধারণকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছেন। শপথ গ্রহণ শেষ হইলে বিশাল জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।'

বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ় নেতৃত্বগুণই তাঁকে মার্চের অবশ্যম্ভাবী রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় পৌঁছে দিয়েছিল। বিশেষ করে নভেম্বরে নির্বাচনের পরে কুচক্রী পাকিস্তানি নেতাদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানার কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু পরিমিতিবোধে অনবদ্য এক ধৈর্যশীল ও উদ্ভাবনী নেতৃত্বের পরিচয় দেন। উপরিউক্ত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সেসবের অন্যতম উদাহরণ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৯৭০-৭১ সালে একশ্রেণির সন্ত্রাসী তথাকথিত বাম রাজনীতিক দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল, যে কারণে একই সঙ্গে পাকিস্তানি চক্র এই অপরাজনীতির প্রভাবের কথা সুকৌশলে প্রচার করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন স্বাধিকার আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ খুঁজছিল। ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করেন, যা ৪ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হয়। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ইউনিয়নে ইউনিয়নে, মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে, তাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত হোন।' রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, সেসব বিপ্লবীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'চোরের মতো রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।' ইত্তেফাক আরও লিখেছে, 'সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের খতম করার জন্যে প্রত্যেক নাগরিককে বাঁশের এবং সুন্দরী কাঠের লাঠি বানাইবার পরামর্শ দিয়া শেখ সাহেব বলেন, প্রত্যেকের হাতে আমি হয় বাঁশের নয় সুন্দরী কাঠের লাঠি দেখিতে চাই। কিন্তু খবরদার আমার হুকুম ছাড়া সেগুলি ব্যবহার করবেন না।'

জানুয়ারি থেকে মার্চের সময়কালের পত্রপত্রিকাগুলোয় অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু খুবই পরিশীলিত ধাপে তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজ করছেন। একই সময় পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন, পত্রপত্রিকায় মন্তব্য-বিবৃতি পাঠাচ্ছেন, যাতে জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা আওয়ামী লীগ ও তার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কোনোভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়। ভুট্টোর এসব উসকানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির জবাবে বঙ্গবন্ধু ধীরস্থির, পরিণত ও শক্ত অবস্থান জানান দিয়ে পালটা বক্তব্য দিতেন। এরকম একটি বক্তব্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিগুলোর যৌথ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু দেন, যার সারাংশ দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি: 'জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীদের প্রতি আগুন লইয়া খেলা হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আমারও ৬-দফার মোকাবিলার জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে...সাত কোটি বাঙ্গালীর বুকের উপর মেশিনগান বসিয়েও কেহ ঠেকাতে পারবে না।' ১৮ ফেব্রুয়ারি মর্নিং নিউজ পত্রিকাও বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্য প্রচার করে, যার সংবাদ শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে কোন শক্তিই থামাতে পারবে না বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা'।

একই সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো ছয় দফা ও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া-নেওয়া নিয়ে নানারকম বক্তব্য-বিবৃতি প্রচার করছিল। গ্রহণযোগ্য প্রায় সব যুক্তিই বঙ্গবন্ধু আমলে নেন এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন। ফলে বাঙালির মুক্তির যে অভীষ্ট লক্ষ্য অনিবার্যভাবেই একটি সম্মিলিত ও সমন্বিত আয়োজনে স্বাধীনতাসংগ্রামের উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে ধাবিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির কিছু প্রস্তাব আলোচনায় আসে, যেখানে সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পার্টি সুস্পষ্টভাবে এই মর্মে উপসংহারে আসে যে, 'এই সংগ্রাম স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা।'

একই সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো ছয় দফা ও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া-নেওয়া নিয়ে নানারকম বক্তব্য-বিবৃতি প্রচার করছিল। গ্রহণযোগ্য প্রায় সব যুক্তিই বঙ্গবন্ধু আমলে নেন এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন

এরকম নানা মত ও পরামর্শ, ভুট্টোর উদ্‌বেগ, অপপ্রচার ও হুমকির জবাব দেন বঙ্গবন্ধু ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সংবর্ধনা সভায়, যার বিস্তারিত ছাপা হয় পরদিন ১ মার্চ ইংরেজি ডন পত্রিকায়। চলমান সংগ্রামের মাধ্যমে ছয় দফা কর্মসূচি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি বিশদ বিশ্লেষণ করে এই অনুষ্ঠানে একটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। ইতঃপূর্বে ভুট্টোর দেওয়া বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধিকার আন্দোলনকে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হিসাবে ব্যঙ্গ করার প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যারা এসব কথা বলে তারা আসলে সংখ্যালগিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এসব মন্তব্য শুধু আপত্তিকরই নয়, দেশের ভবিষ্যতের জন্যেও অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।' বঙ্গবন্ধু সতর্ক করে বলেন, 'যারা আওয়ামী লীগের সরকার গঠনে বাধা সৃষ্টি করছে ও গণতন্ত্রের জন্যে হুমকি হয় এমন কাজ করছেন তার ফলাফল এমন কিছু হতে পারে যার জন্যে আমরা দায়ী থাকবো না।' এই আলোচনায় তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির চিন্তা বিশ্লেষণ করে নতুন সরকারের জন্য তাঁর এই অর্থনৈতিক দর্শনকে কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বা ধাপে ধাপে সে পর্যায়ে উন্নীত করার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'দেশের অর্থনীতি হবে জনকেন্দ্রিক, যাতে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার পায়।' একই আলোচনায় তিনি ২৩ বছরের পাকিস্তানি নিষ্পেষণের বিবরণ দিয়ে বলেন, 'এই ২৩টি বছর গেছে আমাদের প্রতারণা, হতাশা ও দুঃখের মধ্যে। আমরা এই নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেতে ও বাংলাদেশের মানুষকে একটি ভালো

জীবন উপহার দিতে আমাদের সংগ্রাম আব্যাহত রেখেছি।' এই ভাষণের শেষের দিকে এসে বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' স্লোগানের একটি অনুপম ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, 'এই স্লোগান কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, এই স্লোগান বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির স্লোগান। এই স্লোগান আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার ও সাংস্কৃতিক মুক্তিরও স্লোগান।'

আমাদের প্রাক মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হয় ৭ই মার্চ, যেদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাসংগ্রামের ডাক দিয়ে বাঙালি জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু একাত্তরের জানুয়ারি থেকে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক সভার আগমুহূর্ত পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সত্তরের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা না দিতে যেসব হঠকারী কাজকর্ম পাকিস্তান সরকার ও ভুট্টো মিলে করেছে তাতে বঙ্গবন্ধু অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ বক্তব্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হঠকারী ভুট্টোর পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল, যে কারণে তাদের ক্ষমতার মোহ, ক্ষোভ ও ব্যক্তিগত পরাজয়ের অস্থিরতা মিলে পুরো বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির জন্ম দেয়। লোপ পায় মানবিকতা। তাদের জিঘাংসার কাছে বলি হতে হয় ৩০ লাখ বাঙালির জীবন ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম। কিন্তু ইতিহাস তাদের পরাজিত করে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

যেসব তথ্যাদি এখন পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে বিস্তর গবেষণার সুযোগ আছে। যারা আগ্রহী, বিশেষ করে তরুণসমাজ, তাদের অবশ্যই টেবিল ঘুরিয়ে বসতে হবে। এই বাংলাদেশটা এমনি এমনি হয়নি বা 'কারও দানে পাওয়া নয়'। এই বাংলাদেশ এমনই এক দেশ, যে দেশে শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে নিতান্তই এক অজপাড়াগাঁয়ে, যিনি পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র নেতা–শুধু সংগ্রামের জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন একটি দেশের মানুষকে স্বাধীনতার আনন্দ এনে দিতে।

॥ দুই ॥

সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনগণ ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হয় ও দৃশ্যত দেশের নিয়ন্ত্রণভার বঙ্গবন্ধুর হাতেই এসে পড়ে। সমমনা আন্দোলনরত রাজনৈতিক সংগঠনগুলো একে একে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের মৌলিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে থাকে এবং স্বাধিকার অর্জনের দিকে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ্য ও স্পষ্ট করতে থাকে। ৮ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ সভাশেষে কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রস্তাবাকারে পেশ করে জানায়, "আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহৃত হইবে।" এটি ছিল ছাত্রলীগের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। একই প্রস্তাবে ছাত্রলীগ আরও জানায়, "প্রত্যেক জেলা শহর হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯ জন সদস্য সর্বমোট ১১ জনকে নিয়া 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করার প্রস্তাব করিতেছে। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে...বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিতেছে।" প্রস্তাবের শেষে উল্লেখ করা হয়, 'দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানি পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানি সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।'

৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিবৃতি দেয়, যার শিরোনাম ছিল: 'শত্রু বাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন, গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন'। কমিউনিস্ট পার্টি তার অবস্থান পরিষ্কার করে এভাবে–'বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে একটা পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন...পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে দাবি উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।' একই তারিখে (৯ মার্চ) দৈনিক পাকিস্তান একটি সম্পাদকীয় অভিমত প্রকাশ করে, যেখানে উল্লেখ করা হয়: 'গত রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মুক্তিপাগল প্রতিটি বাঙ্গালীর মনোভাব।' এখানে বর্তমানকালের সংশয়ী সমাজের জন্য আবশ্যিক তথ্য হলো, ৭ মার্চের ভাষণের দুইদিনের মধ্যেই তখনকার সংবাদমাধ্যম এই ভাষণকে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যায়িত করেছিল, সেসব সংশয়ী বেত্তাবর্গের জন্য ইতিহাসের এসব তথ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া খুবই দরকার ছিল।

৯ মার্চ মওলানা ভাসানী একটি প্রচারপত্রে লিখেন, 'আজ আমি সাত কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরী আহ্বান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম, ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে, ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসক গোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম করা।' সেদিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ন্যাপের জনসভা। ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যার অন্যতম ছিল, 'শেখ মুজিবুর রহমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়, তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবণ শুল্ক, নগর শুল্ক, হাটবাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্সসহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা।'

ওইদিন বিকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ একটি ব্যাখ্যাপত্র প্রদান করেন, যাতে কখন কোন প্রতিষ্ঠান খোলা বা বন্ধ থাকবে ও জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন করে জনস্বার্থে দায়িত্ব পালন করবে, সেসবের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়।

১০ মার্চ বিবিসি সূত্রে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সংবাদ প্রকাশ করে, জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি ৭ মার্চ ঢাকা এসে পৌঁছালেও ঢাকা হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি তার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সম্মত ছিলেন না। সংবাদটি ছিল এরকম যে, 'আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা হাইকোর্টে হরতালের দরুন কোন বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত সামরিক গভর্নরের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতে সম্মত হইতেছেন না।' এখানে উল্লেখ্য, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ গভর্নর হিসাবে জেনারেল টিক্কা খানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

এসময়ে ঢাকার সংবাদপত্রগুলো ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনায় মুখর ছিল। বাংলাদেশে রক্তপাতের জন্য ভুট্টোকে দায়ী করে একাধিক সংবাদভাষ্য প্রচারিত হয়। ১১ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ আরও একটি বিবৃতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে বঙ্গবন্ধুর অতিরিক্ত কিছু

নির্দেশনা সংবাদমাধ্যমে পাঠান, বিশেষ করে ব্যাংকগুলো খোলা রাখার সময়সূচি এবং লেনদেন সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনা এই বিবৃতির মাধ্যমে দেওয়া হয়। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিল দেশের সমুদয় কর্মভার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও পরামর্শে পরিচালিত হচ্ছিল। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে দেশের জনগণের শক্তিকে সুসংহত করে বঙ্গবন্ধু তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছার কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। এসব আন্দোলিত আয়োজনে ভুট্টোও কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন, যা করাচিতে ১৪ মার্চের জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে কিছুটা বোঝা যায়। পিপিআই সূত্রে দৈনিক পাকিস্তান ১৫ মার্চ এই মর্মে সংবাদ প্রকাশ করে যে, 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টো আজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দিয়েছেন।...তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে তার তারবার্তাটি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি আবেদন।' বলা বাহুল্য, ভুট্টোর এই আবেদনে বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে কোনো সাড়া দেওয়া হয়নি। আন্দোলন আরও তীব্রতর হয় এবং বস্তুত পুরো বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর নিচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামের লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকে।

১৫ মার্চ দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ছাপা এই কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, দেশের দায়িত্ব তখন প্রকৃতই বঙ্গবন্ধুর হাতে। জাতীয় নির্বাচনে ম্যান্ডেট দেওয়া ছাড়াও তাঁকেই দেশের আপামরসাধারণ মুক্তির ত্রাতা হিসাবে গণ্য করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে

সাতই মার্চের মহা-আন্দোলনের ডাকের পর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা। এদিন তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি পাঠান। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিস্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের জন্যে এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে যে-কোন শক্তির মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।' এই বিবৃতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মোট ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন, যেসব নির্দেশমালা অনুসরণ করেই ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

১৫ মার্চ দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ছাপা এই কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, দেশের দায়িত্ব তখন প্রকৃতই বঙ্গবন্ধুর হাতে। জাতীয় নির্বাচনে ম্যান্ডেট দেওয়া ছাড়াও তাঁকেই দেশের আপামরসাধারণ মুক্তির ত্রাতা হিসাবে গণ্য করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অঙ্গুলিহেলনে সব দিগন্ত একরৈখিক হতে বাধ্য হয়েছিল, যা বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

॥ তিন ॥

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্ন উপস্থিত হয়। সেসময়ে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে খোদ দলের মধ্যেই অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা দফায় দফায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হতে থাকেন এবং সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে নির্দেশনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে জনসাধারণ, বিশেষত সর্বস্তরের সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের দেশব্যাপী আশু করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রায় প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে উঠে এবং কোথাও কোথাও সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হয়। একদিকে প্রশাসন, অপরদিকে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর করণীয় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনার প্রয়োজন হলে বঙ্গবন্ধু সেসব বিষয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং ১৪ মার্চ একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি ও নির্দেশনা দেন, যা পরদিন (১৫ মার্চ) সব দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়।

এর আগে ১১ মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ দেশের অর্থনীতি সমুন্নত রাখতে একটি বিবৃতি দেন, যাতে তিনি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, 'আমাদের আন্দোলন একটি অভূতপূর্ব উচ্চমাত্রায় পৌঁছাতে পেরেছে, কারণ দেশের প্রতিটি মানুষ নিজেদের কর্তব্যকাজে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাগুলো মেনে চলছেন। সর্বস্তরে আন্দোলিত মানুষের মধ্যে প্রখর দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যা আমাদের সকলের জন্যে অনুপ্রেরণামূলক। আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের উৎপাদন অর্থনীতি সমুন্নত রাখতে সর্বশক্তি নিয়োজিত রাখতে হবে।' (সূত্র: দ্য ডন, ১১ মার্চ ১৯৭১)। এই বিবৃতিতে তাজউদ্দীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যাংকগুলো খোলা রাখা এবং লেনদেন মাত্রা, সময়সূচি সম্পর্কে কিছুটা প্রশাসনিক পরিবর্তনের কথাও জানান। এই বিবৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যথাযথ সময়ে পরিশোধের বিষয়ে; যেখানে তিনি বলেন, কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তারাই বেতন পরিশোধের কাজে অফিসে আসবেন ও কর্তব্য পালন করবেন। জেলখানা, জেল ওয়ার্ডেন ও জেল অফিস যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত দপ্তরগুলো সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। এমনকি সব বিমা কোম্পানিগুলোও যথাযথভাবে কাজ করবে।

১১ মার্চের নির্দেশনা ছিল মূলত আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি যেন কোনোভাবেই স্থবির না হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদায় যেন কোথাও ঘাটতি পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। দলের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এসব নির্দেশনা সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন সব মহলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ফলে আন্দোলন ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনে এই আন্দোলনের প্রতি গভীর আস্থা জন্মায়।

১৪ মার্চ করাচির এক জনসভায় পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনের 'দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে'

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দেন। (সূত্র: দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ মার্চ ১৯৭১)। নরম সুরে ভুট্টো বলেন, 'দেশের দুইটি সংখ্যাগুরু দল জাতীয় স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ সেটাই কামনা করে।' ভুট্টো জানান, আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তিনি এখনো পূর্ব পাকিস্তানে যেতে রাজি আছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দল বলেই তিনি তার দলের সঙ্গে কথা বলার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য তাদের একসঙ্গে চলার সময় এখনো রয়েছে। ভুট্টোর এই চতুর ভাষণে একটি বিষয় স্পষ্ট–৭ মার্চের দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূল বক্তব্যের প্রতি ভুট্টো কোনো ধরনের গুরুত্ব না দিয়ে তার নিজের অংশে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের অজুহাত ক্রমাগত দিতেই থাকেন। অথচ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে ইতোমধ্যে আসন তৈরি করে নিয়েছে। বাংলাদেশের তখনকার ভূখণ্ডে যেসব দমনপীড়ন, অত্যাচার ও রক্তপাত ঘটে চলছিল, ভুট্টো সেসব প্রসঙ্গ একেবারেই এড়িয়ে চলেছেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না–এমনভাবে করাচির সভায় বক্তব্য দিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবিদার হলেও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অন্যায়-অবিচারের প্রতি ভুট্টো কখনোই সোচ্চার হননি। ফলে পাকিস্তান সামরিক চক্র ভুট্টোকেই তাদের অন্যতম সমর্থক ও প্রেরণাদাতা হিসাবে গণ্য করে তাদের অন্যায়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়াতে থাকে।

সংগত কারণেই ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু একটি পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্র জারি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, যেখানে প্রকৃতই তিনি গণমানুষের প্রাণের নেতা হিসাবে দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করেন। শুরুতেই তিনি বলেন, 'আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তাঁরা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ–সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র–সবাই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে– তাঁরা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।'

এই বিবৃতি বঙ্গবন্ধুর মার্চ আন্দোলন জীবনের সেরা বিবৃতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যেখানে তিনি মোট ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। পটভূমিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাঁদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাৎ হতে বাধ্য।'

এখানে উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু এই বিবৃতির মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জাতিকে দলমতনির্বিশেষে একটি বিষয়ে আওতাভুক্ত করেছিলেন আর তা হলো–সমগ্র জাতিই নিপীড়িত মানুষের ও তাঁদের পরিবারের পেছনে আছে। বিশ্বের খুব কম নেতাই এমন দুর্দিনে দেশের সব মানুষকে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৫ মার্চের দেওয়া বঙ্গবন্ধুর নতুন কর্মসূচি নির্দেশাবলি আকারে জারি করা হয়। উল্লেখ করা হয় যে, "নির্দেশাবলী কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।' নতুন কর্মসূচিকে ১নং নির্দেশ, ২নং নির্দেশ–এভাবে ৩৫নং নির্দেশ পর্যন্ত ভাগ করে অনেকটা পরিপত্র বা সার্কুলার আকারে জারি করা হয়। পৃথিবীর মুক্তিকামী দেশগুলোর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে এই রকমের নির্দেশনামা জারি করে কোনো নেতা দেশের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পরিপত্রে প্রথমেই ঠাঁই পায় সরকারি সংস্থাগুলোর করণীয়, যেখানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের সব কোর্ট হরতাল পালন করবে। দ্বিতীয় নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেন। তৃতীয় নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি ও এসডিওদের অফিস না খুলে নিজেদের এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের কথা বলেন। পুলিশের সঙ্গে প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে যোগ দিতে পরামর্শ দেন। বলা হয়, জেল অফিস খোলা থাকবে এবং আনসার বাহিনী তাঁদের দায়িত্ব পালন করবে। চতুর্থ নির্দেশে অভ্যন্তরীণ বন্দরগুলো পরিচালনার নির্দেশনায় উল্লেখ করেন–খাদ্য সাহায্য বা মাল খালাসের নিয়মিত কাজ অব্যাহত থাকলেও সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেওয়ার কাজে বন্দর ব্যবহার করা যাবে না। পঞ্চম নির্দেশে আমদানি শুল্ক পরিচালনার জন্য বলা হয়–ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ অ্যাকাউন্ট খুলে কাস্টমস কালেক্টররা যেন সেগুলো পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী সেসব অ্যাকাউন্টে কাস্টমস কালেক্টররা আদায়কৃত শুল্ক জমা রাখবেন, কোনো মতেই তা কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

একে একে নির্দেশে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে, সড়ক পরিবহণ, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম-মনি অর্ডার, স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন পরিচালনার নির্দেশ দেন। ১১নং নির্দেশে সুস্পষ্ট বলেন, 'বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁরা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।' পরবর্তী নির্দেশগুলোয় হাসপাতাল, বিদ্যুৎ, গ্যাস-পানি, ইট ও কয়লা সরবরাহ, ধান-বীজ-সার ও কীটনাশক ওষুধ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ঘোষণা দেন। পাওয়ার পাম্প, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও নির্মাণকাজ, সাহায্য পুনর্বাসন, যাবতীয় কলকারখানা, বেতন ও পেনশন প্রদান, ব্যাংকিং সময়, ট্রাভেল এজেন্ট, ফায়ার ব্রিগেড, পৌরসভা, এমনকি কর আদায় পর্যন্ত নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেন। ৩৪নং নির্দেশে তিনি আদেশ দেন, 'সকল বাড়ির শীর্ষে কাল পতাকা উত্তোলিত হবে।' সর্বশেষ নির্দেশে বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম পরিষদগুলোকে এসব নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কথা বলেন।

জগতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যখন কোনো দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের একাডেমিক বিশ্লেষণ করেন, জানি না তাঁদের মনে কোনো ধারণা আছে কি না। বাংলাদেশের জাতির পিতা হয়ে ওঠা এই রাজনীতিবিদ মুক্তিসংগ্রামের অনবদ্য এক দায়িত্বশীল ইতিহাস রচনা করেছেন ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম তিন সপ্তাহেই। তাঁদের সেই বিশ্লেষণে যা-ই বেরিয়ে আসুক, বাংলাদেশের মানুষের গৌরবগাথা অস্বীকার করে কোনো বই বা তত্ত্ব রচনা কোনোদিনও সম্ভব হবে না। কারণ, বঙ্গবন্ধুর মতো এমন দূরদর্শী নেতৃত্ব সংগ্রামের স্বপ্নগাথায় বোনা যে দেশ, তার ঠাঁই হয়ে আছে মহাকালের স্বপ্নগৌরব ছুঁয়েই।

লেখক: পরিচালক, আমাদের গ্রাম গবেষণা প্রকল্প

পিতা মুজিব এবং তাঁর সংগ্রাম

সরদার সিরাজুল ইসলাম

টুঙ্গিপাড়ার অজপাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্তের সন্তান (জন্ম ১৭ মার্চ ১৯২০) মুজিব বড়ো হয়েছিলেন স্বীয় প্রতিভায়। নিজেকে গড়েছিলেন তেজে, সাহসে, ভালোবাসা এবং অঙ্গীকারে। সমাজের দুর্বল মানুষের প্রতি শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মুজিবের কৈশোরের সেই অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ন ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সোনার চামচ নিয়ে জন্মাননি, আর রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেও শ্রেণি অবস্থান হয়নি বদল তাঁর চলন-বলন-কথনের মধ্যে। নিজের নতুন বস্ত্র অন্যকে দান করা এবং নিজেদের গোলার ধান ক্ষুধার্তকে বিলিয়ে দেওয়া কিশোর সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাহসী মুজিবকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অভিযোগে কারাগারে যেতে হয়েছিল। তিনি পেরেছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা ও মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক ছাত্রদের দাবি আদায় করতে। গোপালগঞ্জের কৃষক আন্দোলনেও তাঁকে পাওয়া গেছে অগ্রণী ভূমিকায়। কলকাতায় গান্ধীর কুইট ইন্ডিয়া, নেতাজি সুভাষ বসুর হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (১৯৪৬) বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক ডা. বিধান রায়ের বাড়িতে হামলা চালালে তা প্রতিহত ও পাহারা, কলকাতা মাদ্রাসা ও লেডি ব্রাভোন কলেজে লঙ্গরখানার দায়িত্বে ছিলেন মুজিবই। শেরেবাংলাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কারের (১৯৪১) প্রতিবাদমিছিলও নামিয়েছিলেন মুজিব। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে মুজিব ফরিদপুর জেলার নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করেন সফলভাবে। ঢাকায় শুরুতেই মুজিবকে পাওয়া গেল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পটভূমি সৃষ্টিতে। গঠিত হলো গণতান্ত্রিক যুবলীগ (৬

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭), ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮) এবং জেলে বসেই নির্বাচিত হলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক (২৪ জুন ১৯৪৯)। এরই মধ্যে বাংলা ভাষার দাবিতে প্রথম সফল ধর্মঘট পালনকালে পিকেটিং অবস্থায় ভাষার দাবিতে প্রথম বন্দি (১১ মার্চ ১৯৪৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন সমর্থনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার (১৯৪৯) মুজিব। মুচলেকা দেননি, তাই আইনের ছাত্রজীবনের শেষ। শুরু হলো জীবনের আরেক অধ্যায়। খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন। আবার বন্দি দীর্ঘদিন। আওয়ামী লীগের তেজি লোকটি (মুজিব) অক্টোবর (১৯৫০) থেকে দীর্ঘদিন বন্দি, সংগঠন নিস্তেজ। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যার ধারাবাহিকতায় এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলে অনশনরত রাজবন্দি মুজিবের ঐকান্তিক আগ্রহে দোদুল্যমান রাজনৈতিক নেতাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে ছাত্র-যুবকরা সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক মাইলস্টোন সৃষ্টি করে একুশে ফেব্রুয়ারি অন্তত সাতজন ছাত্র-যুবকের রক্তের বিনিময়ে। মুজিব ছাড়া পান ১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। যাদের রক্তের বিনিময়ে মুক্তি পেলেন, তাঁদের ত্যাগ মুজিবকে আরও বেশি সাহসী গতিশীল করে তোলে। চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবের শ্রম বৃথা যায়নি। কিন্তু বাঙালিদের প্রাদেশিক সরকার পর্যন্ত চালাতে না দিলে জেলে পাঠাবে–এ ধরনের আচরণ মুজিবকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। মন্ত্রিত্ব না দলের দায়িত্ব–দুটির একটির মধ্যে মুজিব দলীয় নেতৃত্ব বেছে নিয়ে একটি নজির স্থাপন করেছিলেন।

সমর-নায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে (৭ অক্টোবর ১৯৫৮) চারদিনের মধ্যে মুজিবকে জেলে পুরলেন (১২ অক্টোবর ১৯৫৮), রাখলেন দেড় বছর। ১৯৬১ সালে মণিসিংহ, মানিক মিয়া, খোকা রায়দের সঙ্গে এক বেঠকে মুজিব বলে ফেললেন, 'ওদের সাথে আর থাকা যাবে না। স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে হবে।' সবাই একমত হলেও স্ট্র্যাটেজি হিসাবে আন্দোলন স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর মনে হলো মুজিবের পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতির শেষ সুতো ছিন্ন হলো। মওলানা ভাসানী চীনের 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'-এ আটকে গেলেন। আইয়ুবের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য নেতা কেবল মুজিব। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে একধাপ এগিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহাসিক ছয় দফার দাবি পেশ করলেন লাহোর (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করলেন। বন্দি রাখলেন দীর্ঘদিন মুজিব এবং তাঁর প্রায় সব অনুসারীকে (১৯৬৬-৬৮)। পাঁয়তারা করল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি দেওয়ার। জনগণ মাঠে নামল। সৃষ্টি হলো ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে উনসত্তরের গণ-আন্দোলন। জনতার শক্তির কাছে অস্ত্রের পরাজয়। মুজিব মুক্তি পেলেন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)। বাংলার জনগণ ভালোবেসে মুজিবের নাম রাখল বঙ্গবন্ধু আর ক্ষমতা ছাড়তে হলো আইয়ুবকে।

এরপর তিনি আর মুজিব নন–বঙ্গবন্ধু। কৃতজ্ঞতার এ ঋণ শোধ করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আইয়ুবের উত্তরাধিকারী ইয়াহিয়ার কাছ থেকে প্রথমেই দুটি জিনিস আদায় করে নিলেন। পেরেটির (পূর্ব ও পশ্চিমের সমান প্রতিনিধি) পরিবর্তে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং জনগণের ভোটে নেতা নির্ধারণ। কৌশলে মুজিব জয়ী হলেন। আর জনগণ পাকিস্তানের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টিতে মুজিবের দল আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, সমগ্র পাকিস্তান শাসনের অধিকার দেয় (ডিসেম্বর ১৯৭০); কিন্তু পাকিস্তানিরা 'বাঙালি নেটিভ' দ্বারা শাসিত হওয়া মেনে নেয়নি। সাহসী মুজিব গভীর বিচক্ষণতার সঙ্গে দুর্বল অবস্থানে দাঁড়িয়ে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল বের করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ (বস্তুত ১ মার্চ) থেকে ঘোষণা করলেন পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ। গান্ধীর অসহযোগ সফল হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এমনকি বাস্তিল কারাগারের পতন, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মাও সেতুংয়ের লংমার্চ–এসব ঘটনার চেয়েও ব্যতিক্রম কৌশল। পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের ঢাকায় আসতে মুজিবের অনুমতি নিতে হয়েছিল (১৫ মার্চ ১৯৭১)। আর তার উপস্থিতিতে এতদঞ্চলে চলছিল মুজিবের প্যারালাল সরকার। শত্রুপক্ষের কামান-বন্দুককে উপেক্ষা করে ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে ৭ মার্চের ভাষণে সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য জনগণের 'মুক্তি ও স্বাধীনতার' স্পষ্ট ঘোষণা। প্রকাশ্যে শত্রুকবলিত, আকাশে বোমারু বিমান পরিবেষ্টিত এলাকায় দাঁড়িয়ে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এর ঘোষণা এবং 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) মোকাবিলা' করার নির্দেশ দেওয়ার সাহস মুজিব ছাড়া বিশ্বে অন্য কেউ দেখাননি। আলোচনার নামে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেও সেই আলোচনা সফল হয়নি। ইয়াহিয়া সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন আর মুজিব প্রতিরোধের জন্য তৈরি। তাই ২৫ মার্চ রাতে শত্রুরা যখন মুজিবকে বন্দি করে, ইথারে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে মুজিবের পূর্ব রেকর্ডকৃত কণ্ঠস্বর: 'This may be my last massage from today, Bangladesh is Indenpendent.' আর মুজিব সৈনিকরা তখন মুক্তাঞ্চলে, প্রতিরোধে। বন্দিত্ব না এড়িয়ে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুজিব যে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের আলোকে একটি নজিরবিহীন কৌশল হিসাবে চিহ্নিত। স্বাধীনতার দায়বদ্ধতার ঋণ শোধ করতে যেন ভারতকে চরম মূল্য না দিতে হয় বাঙালিকে। মুজিবের সে হিসাব নির্ভুল। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার যোগ্য উত্তরসূরি তাজউদ্দীন আহমদ গঠন করেন মুজিবনগর সরকার (১০ এপ্রিল ১৯৭১)। তৈরি হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী এবং

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এমনকি বাস্তিল কারাগারের পতন, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মাও সেতুংয়ের লংমার্চ–এসব ঘটনার চেয়েও ব্যতিক্রম কৌশল

কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে মন্ত্রী করে গঠিত মুজিবনগর সরকারের বিচক্ষণতায় ভারতসহ মিত্রদেশের সহযোগিতা ও সমর্থনে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈনিক রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দেশ পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয়। মুক্ত স্বদেশে ফিরে মুজিব মাত্র তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো, বিদেশি সৈন্য অবস্থানকালেও বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশের স্বীকৃতি আদায়, ১০ মাসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণয়ন, বিদেশি প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই মাত্র তিন বছরে সীমাহীন আর্থিক সংকট, বার্ষিক সাহায্য ঋণ অনুদান মাত্র ৫০ কোটি ডলার দিয়ে কোটি লোকের পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসন, উৎপাদন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি স্বাভাবিক পর্যায়ে আনতে সক্ষম হন।

রাষ্ট্রপরিচালনায় এসে মুজিব দেখলেন কলোনিয়াল, বুল দ্বারা রাজার মতো দেশ শাসন করা যায়; কিন্তু দুঃখী মানুষের কল্যাণ আসে না 'চাটার দল' খেয়ে ফেলে। ধরা যায় না। তাই রাষ্ট্রনায়কের দ্রোহ কায়েমি স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়, 'চুরি আমার কৃষক-শ্রমিক করে না। আমরা ৫ শতাংশ শিক্ষিত সমাজই সবচাইতে করাপ্ট পিপল আর আমরাই বড়ো বড়ো কথা বলি।' তিনি যে গণতন্ত্র চেয়েছিলেন তাতে 'রাতের অন্ধকারের বিদেশ থেকে টাকা পাওয়া' যায় না। শোষিত মানুষের পক্ষ নেওয়ায় আতঙ্কিত হয় সমাজের দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়:

(ক) ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় নাগরিকত্ব-সম্পত্তি হারানো ব্যক্তিরা ।
(খ) ধর্মের নামে যাদের রাজনীতি-ব্যাবসা বন্ধ করা হয়েছিল।
(গ) রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।
(ঘ) জমির সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং নির্ধারণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা।
(ঙ) গোলাম আজম, হামিদুল হক চৌধুরীসহ পাকিস্তানি বাহিনীর যেসব নেতৃস্থানীয় দোসরকে নাগরিক হওয়ার 'অযোগ্য' ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই ৩৯ জন ব্যক্তি।
(চ) যে ৮৪ জন পদস্থ কর্মকর্তার চাকরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
(ছ) যদিও বঙ্গবন্ধু সব সাংবাদিককে নিয়মিতভাবে বেতনভাতাদি এবং উপযুক্ত সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে পত্রিকা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, তবুও পত্রিকা মালিকরা সম্পত্তি হারিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।
(জ) বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি সফল হয়নি, তবে এর প্রাথমিক পদক্ষেপের মধ্যে চার মূলনীতিভিত্তিক জাতীয় ঐক্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও দুর্নীতি উচ্ছেদ এবং প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক সমবায় ব্যবস্থায় যথাক্রমে সরকারি কর্মচারী, লুটেরা ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয় লুটপাট বন্ধ, চাকরি হারানো এমনকি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয়ে। ভূস্বামী জমি হারানোর ভয়ে। জেলা গভর্নরের অধীনে আমলাদের নিয়োগও ব্যুরোক্র্যাসিকে শঙ্কিত করে। চুরি-ডাকাতির জন্য থানাদারকে দায়ী, শহরে পাঁচ কাঠার ওপর একটির বেশি বাড়ি না থাকার বিধানও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আতঙ্কিত করে।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং সমাজের এসব প্রভাবশালীর সম্মিলিত অপচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এর নেতৃত্বে কারা ছিল, সেকথা জাতি ইতোমধ্যে জেনে গেছে। খুনিদের আইন করে বিচার থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিশ্বে এটি একটি খুনি রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সরদার ফজলুল করিম যথার্থই বলেছেন, 'শেখ মুজিবকে আমরা ঈর্ষা করেছি আমাদের অতিক্রম করে বড়ো হওয়াতে। সবদিকে বড়ো, তেজে, সাহসে, স্নেহে, ভালোবাসায় এবং দুর্বলতায়। সবদিকে। এবং সেই ঈর্ষা থেকেই আমরা তাঁকে হত্যা করেছি। কেবল এই কথাটি বুঝিনি যে ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে ঈষিতে স্থান দখল করা যায় না।'

যারা বিশেষ করে যে ব্যক্তি এদেশে বঙ্গবন্ধুর স্থান দখল করতে চেয়েছিল, সে এবং তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ফাঁসি হয়েছে বঙ্গবন্ধুর খুনির, ফিরে পেয়েছি বাহাত্তরের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সংবলিত সংবিধান। দেশে এখন স্বমহিমায় উচ্চারিত হচ্ছে–জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক : গবেষক ও কলামিস্ট (প্রয়াত)

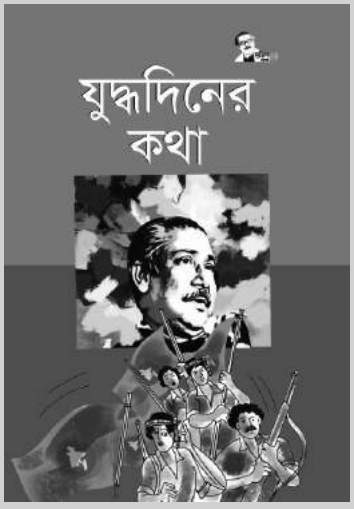

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতার জন্মদিন সংবাদপত্রে প্রতিফলন

জন্মদিন পালনের অবকাশ খুব একটা আসেনি তাঁর জীবনে। লড়াই-সংগ্রাম আর স্বজাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে কেটেছে ব্যস্ত সময়। কারাগার থেকে কারাগার আর মাঠের লড়াইয়ে পাড়ি দেওয়া দীর্ঘ পথ–এই তো তাঁর জীবন। এর মাঝে জন্মদিন পালনের অবকাশ কোথায়? নিজের জন্মদিন নিয়ে তিনি নিজেও কখনো খুব একটা উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। তাঁর ভাষায়: 'আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু। আমি তো আমার জীবন জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছি।' এই জনগণকে ভালোবেসে, তাদের সঙ্গে নিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন তাঁর পরম আরাধ্য বাঙালির স্বাধীনতা–স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশে কেমন কেটেছে বাঙালির এই মহানায়কের জন্মদিন। তখনকার পত্রপত্রিকা থেকে সেই চিত্র তুলে এনেছেন– **পপি দেবী থাপা**

সংবাদ ১৭ মার্চ ১৯৭২
আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন

আজ (শুক্রবার) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩তম জন্মদিবস। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজ এ দিনটিকে পালন করবে। আজকের এদিনেই বাংলাদেশের মহান বন্ধু ভারতের

মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে শুভাগমন করছেন। একই দিন দু'টো উপলক্ষ হওয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সংকোচন করা হয়েছে।

আজকে এ উপলক্ষে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল জাতির উদ্দেশে এক বাণীতে ভবিষ্যতে এ দিনটি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হবে না বলে উল্লেখ করেন।

ইতিমধ্যে গতরাতে ছাত্রনেতা জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন, জনাব আ, শ, ম, আবদুর রব, জনাব শাহজাহান সিরাজ ও জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর সুখী ও সমৃদ্ধ দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী প্রচার করবে।

দৈনিক বাংলা, ১৮ মার্চ ১৯৭২

জন্মদিনে অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিকতায় গভীর

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশবাসী গতকাল ১৭ মার্চ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন। অনাড়ম্বর কিন্তু গভীর আন্তরিকতায়।

জন্মদিনে-

অনাড়ম্বর কিন্তু

আন্তরিকতায়

গভীর

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশবাসী গতকাল সতেরই মার্চ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন। অনাড়ম্বর কিন্তু গভীর আন্তরিকতার।

সফররত মহান ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুকে ফল ও মিষ্টি

উপহার দিয়েছেন। তিনি স্বদেশ থেকেই এ ফল ও মিষ্টি নিয়ে আসেন। এ ছিল ভারতের পঞ্চাশ কোটি মানুষের শুভেচ্ছা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ।

এর আগে স্নিগ্ধ সকালে শত শত অনুরাগী সমবেত হয় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের সেই বাড়ীটির অতিপরিচিত অঙ্গনে। তাদের দেখে স্মিতমুখে বেরিয়ে এলেন জাতির জনক শেখ মুজিব।

'আমার আবার জন্মোৎসব কিরে? আয় আয় তোরা আমার কাছে আয়।' এ যেনো নেহাত কোন ব্যক্তির আমন্ত্রণ নয়, যেনো ছিল একটি সাগরের আহ্বান। শ্রদ্ধায় বিনম্র চিত্তে সবাই এগিয়ে এলো কাছে। প্রিয় নেতার হাতে তুলে দিল পুষ্পস্তবক।

(৭-এর পৃঃ ২ এর কঃ দ্রঃ)

সফররত মহান ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দরা গান্ধী জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুকে ফল ও মিষ্টি উপহার দিয়েছেন। তিনি স্বদেশ থেকেই এ ফল ও মিষ্টি নিয়ে আসেন। এ ছিল ভারতের পঞ্চাশ কোটি মানুষের শুভেচ্ছা, বন্ধুত্ব, ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ। এর আগে স্নিগ্ধ সকালে শত শত অনুরাগী সমবেত হয় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের সেই বাড়ীটির অতিপরিচিত অঙ্গনে। তাদের দেখে স্মিতমুখে বেরিয়ে এলেন জাতির জনক শেখ মুজিব।

'আমার আবার জন্মোৎসব কিরে? আয় আয় তোরা আমার কাছে আয়।' এ যেনো নেহাত কোন ব্যক্তির আমন্ত্রণ নয়, যেনো ছিল একটি সাগরের আহ্বান। শ্রদ্ধায়, বিনম্র চিত্তে সবাই এগিয়ে এলো কাছে। প্রিয় নেতার হাতে তুলে দিল পুষ্পস্তবক। গলায় পরিয়ে দিল মালা। এসময় বঙ্গবন্ধুর পরনে ছিল লুঙ্গি গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। সার্থক বাংলার স্বার্থক প্রতিচ্ছবি।

সমবেত অনুরাগীদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব তোফায়েল আহমদ, বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও ঢাকা নগরীর বিভিন্ন আওয়ালীগ শাখারকর্মীবৃন্দ।

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানান। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রিয় নেতাকে মালা পড়িয়ে দেন বাহিনী প্রধান গণপরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রাজ্জাক ও শহর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব ফজলুর রহমান। তাঁরা জাতির জনককে রৌপ্য নির্মিত একটি নৌকা উপহার দেন।

বাংলাদেশ যুব সংঘ জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেন। এ সময় দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোট্টমণি রাসেল, তাঁর মা'মণি বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিব, বড় ভাইয়া লে. শেখ কামাল, সেজ ভাইয়া শেখ জামাল, বড় আপা হাসিনা শেখ, মেজ আপা রেহেনা শেখ ও অন্যান্য প্রিয়জন।

এরপর সমবেত সকলে জাতির জনকের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ কামনা করে পরম করুণাময়ের দরবারে মোনাজাত আদায় করেন। বঙ্গবন্ধুও এ মোনাজাতে শরীক হন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা একটি সুদৃশ্য শুভেচ্ছা কার্ড প্রকাশ করেছে। ঢাকার প্রভাতী দৈনিকগুলো বের করেছে বিশেষ সংখ্যা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মার্চ ১৯৭৩

'দোয়া করি বাংলার মানুষকে সুখী কর'

'বাংলাদেশের জনগণকে সুখী করিতে সফল হও সব সময় এই দোয়ায় করি।' জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার ৫৩তম জন্মবাষিকী উপলক্ষে গতকাল (শনিবার) পি.জি হাসপাতালে তাঁহার অসুস্থ পিতার আশীর্বাদ কামনা করিলে বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান উপরোক্ত উক্তি করেন।

৯৩ বৎসর বয়স্ক শেখ লুৎফর রহমান চিকিৎসার জন্য গত শুক্রবার হাসপাতালে ভর্তি হন। অসুস্থ পিতা প্রিয় পুত্রের জন্মদিনে তাঁহাকে পাশে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং সস্নেহে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বাংলাদেশের শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধিসহ বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ও সুখী দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়া হাসপাতালের বারান্দায় রোগী, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। জাতির জনক হাসপাতালের কর্মচারী এবং ডাক্তারদের সাথেও কথাবার্তা বলেন। সকলেই বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান। –বাসস

বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই
আমার একমাত্র স্বপ্নসাধ : জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু

দৈনিক বাংলা ১৮ মার্চ ১৯৭৩

বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমার একমাত্র স্বপ্নসাধ : জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু

গতকাল শনিবার ছিল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩মত জন্মবার্ষিকী। ভোর থেকেই বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে স্রোতের মতো দর্শনার্থীরা গণভবনে যেতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু এই জনস্রোতের কাছ থেকে ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করেন।

এনা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় দর্শনার্থীদের দ্বারা নন্দিত ও মাল্যভূষিত হওয়ার সময় জাতির জনক আবেগ রুদ্ধ স্বরে বলেন, আপনাদের কাছ থেকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ছাড়া আমার আর কিচ্ছু চাওয়ার নেই। তিনি বলেন, সংকটের সময় সেটাই হবে তাঁর পাথেয়। সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সেটাই তার সুখী সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ার সম্পর্ককে জোরদার করবে।

গণভবনে সববেত জনতাকে তিনি বলেন, এখন তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন এবং সাধ হচ্ছে বাংলাদেশের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফুটানো, তাদের সুখী ও সন্তুষ্ট করা।

প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ ঘরোয়া মেজাজে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

পরে তিনি লনে নেমে গিয়ে একটি খাঁচার কাছে যান। খাঁচায় একটি সুন্দর ময়ূর রাখা হয়েছে। ময়ূরটিকে তিনি নিজের হাতে খাওয়ান এবং অনুগামী সাংবাদিকদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দেন।

সমস্ত প্রটোকল আনুষ্ঠানিকতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপেক্ষা করে জনগণের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবার সঙ্গে অবাধে অকপটে মেশেন। প্রিয় জনগণের দর্শনে তাঁর মুখমন্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন বাণী

রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিপান্নতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অভিনন্দন ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

জাতির সেবা করে যাওয়ার জন্যে বঙ্গবন্ধু যেন সুস্থ থাকেন, তাঁর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে এই কামনা করেছেন।

কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের অভিনন্দন

বাংলাদেশে স্থাপিত বিভিন্ন বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধানেরা গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

বাসস ও বিপিআই পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, ডিপ্লোমেটিক কোর-এর ডীন ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সুবিমল দত্তের নেতৃত্বে গতকাল সন্ধ্যায় তাঁরা সদলে গণভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ও স্ব স্ব দেশের সরকারের তরফ থেকেও তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ও সুখী জীবন এবং বাংলাদেশের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। পরে তিনি তাদের সঙ্গে গণভবনের সবুজ লনে বেড়াতে নেমে আসেন এবং তাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে সেখানে খাঁচায় রক্ষিত পাখী, ময়ূর, হরিণ ও অন্যান্য প্রাণী দেখেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ মার্চ ১৯৭৪

ইন্দিরার অভিনন্দন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁহার ৫৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন।

এক বার্তায় মিসেস গান্ধী জাতিকে পুনর্গঠন ও অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন।

–বাসস। এনা। বিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মার্চ ১৯৭৪

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (রবিবার) যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগের শপথ গৃহীত হয়।

গতকাল সরকারী ও বেসরকারী বিল্ডিং এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র ওশ্রমিক সংগঠন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পোট্রেটসহ তাঁহার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে গমন করে ও জন্মদিনের উপহারস্বরূপ পুষ্পস্তবক প্রদান করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে যাইয়া তাঁহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এইদিন অসুস্থ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ দুই নেতা শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক ও হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মাজারেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বাংলা একাডেমীর পক্ষ হইতে মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম অনুপ্রেরণা এবং আত্মত্যাগের একখানি বই উপহার দেন।

বিভিন্ন মসজিদে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া মিলাদ মহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতেরও আয়োজন করা হয়।

সফররত পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ষ্টিফেন ওলজোস্কি এক বাণীতে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু ও বাংলাদেশের জনগণের সমৃদ্ধি কামনা করেন।

ইহা ছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

Monday, March 18, 1974 : ৮ পৃষ্ঠা ৩০ পয়সা : ভারতে বিমান ডাকে মূল্য ৩৫ পয়সা

৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে পুষ্প আবৃত শয্যায় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (রবিবার) যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগের শপথ গৃহীত হয়।

গতকাল সরকারী ও বেসরকারী বিল্ডিং এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পোর্ট্রেট-সহ তাঁহার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে গমন করে ও জন্মদিনের উপহারস্বরূপ পুষ্পস্তবক প্রদান করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে যাইয়া তাঁহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এইদিন অসুস্থ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমদ দুই নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারেও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

বাংলা একাডেমীর পক্ষ হইতে মহাপরিচালক ডঃ মযহারুল ইসলাম অনুপ্রেরণা এবং আত্মত্যাগের প্রতীকস্বরূপ একখানি বই উপহার দেন।

বিভিন্ন মসজিদে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া মিলাদ মহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতেরও আয়োজন করা হয়।

সফররত পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ষ্টিফেন ওলজোস্কি এক বাণীতে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু ও বাংলাদেশের জনগণের সমৃদ্ধি কামনা করেন।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আওয়ামী লীগ

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বর্তমানে অসুস্থ মহান নেতার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় ও দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগের শপথ গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সহ-সভাপতি ও সংসদ সদস্য ডা. আসাবুল হক ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নসাধ 'সোনার বাংলা' গঠনের উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, দলের সহসভাপতি ও সংসদ সদস্য জনাব মহিউদ্দীন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুর রজ্জাক।বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি প্রধান মিঃ মণি সিং ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম। বিভিন্ন বক্তা বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের আত্মত্যাগ এবং লক্ষ্য অর্জন এই দুই দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন।

ছাত্রলীগ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানাইয়াছেন, 'পাকিস্তান স্বাধীন হইয়াছিল বলিয়াই আজকে বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। অতএব সেইদিন যাহারা পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহারা ভুল করেন নাই।'

বঙ্গবন্ধুর ৫৪তম জন্মবার্সিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব আবুল ফজল উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর নামে শুধু ভক্তি গদগদ হইলে তাহার তথা দেশের জন্য কিছুই করা হইবে না। শুধু বক্তৃতা বিবৃতি, শ্লোগানে মশগুল থাকিলে চলিবে না,–এখানে আবেগের কোন স্থান নাই, কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে আগাইয়া নিতে হইবে।বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 'বঙ্গবন্ধু পদক পরিষদ' গতকাল (রবিবার) প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে।

তিনি স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে থাকার আহ্বান জানান। বিরোধীদল না থাকিলে গণতন্ত্র টিকিতে পারে না। –অতএব, এ বিরোধীদলের ব্যাপারে চরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

সভায় প্রধান বক্তা খোন্দকার মোশতাক আহামদ বলেন, আজ যাহারা সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তুলিতেছে, ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী তাহারা তাহাদের সন্তানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। কারণ, একদিন পিতার এই গর্হিত কাজের জন্য সন্তানদেরকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

জনাব মোশতাক আহমদ বলেন, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র দুইটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগাইয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস পালন স্বার্থক হইবে।

মোল্লা জালালউদ্দিন

ভূমি রাজস্বামী জনাব মোল্লা জালাল উদ্দিন বঙ্গবন্ধুর আজীবনের উদারতার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার মতো হৃদয়বান হইতে ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মহিউদ্দিন বাংলাদেশের সৃষ্টি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি চরম আঘাত বলিয়া অভিহিত করেন।

ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব মনিরুল হক চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

সভাশেষে খোন্দকার মোশতাক আহমদ ছাত্রলীগ অফিসে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘজীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ছবি স্থান পাইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মার্চ ১৯৭৫

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে

আগামীকাল ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস উপলক্ষে দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইবে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। 'বাসস ও বি পি আই' পরিবেশিত খবরে এ কথা জানানো হয়।

দৈনিক বাংলা, ১৭ মার্চ ১৯৭৫

বঙ্গবন্ধুর আজ জন্মদিন

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলার মানুষ আজ পরম শ্রদ্ধায় পালন করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে অভিবাদন জানাবে তাদের মুক্তিদাতা এই মহান সংগ্রামী নেতাকে। মসজিদ, মন্দির, গির্জায়, মঠে আজ বিশেষ প্রার্থনা জানানো হবে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। বাংলার মানুষকে সুখী করে তোলার জন্যে তাঁর যে নিরলস সংগ্রাম তার সাফল্য কামনা করে। তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের বিজয় কামনা করে।

বঙ্গবন্ধুর আজ জন্মদিন

হাজারো কাজের ফাঁকে ছবি : গোলাম মাওলা

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলার মানুষ আজ পরম শ্রদ্ধায় পালন করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে অভিবাদন জানাবে তাদের মুক্তিদাতা এই মহান সংগ্রামী নেতাকে। মসজিদ মন্দির গির্জার মঠে আজ বিশেষ প্রার্থনা জানান হবে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে। বাংলার মানুষকে সুখী করে তোলার জন্যে তাঁর যে নিরলস সংগ্রাম তার সাফল্য কামনা করে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের বিজয় কামনা করে।

বঙ্গবন্ধুর আজ ৫৫তম জন্মবার্ষিকী। প্রিয়তম নেতার জন্মদিনকে পালনের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে এগিয়ে এসেছে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। গ্রহণ করেছে ব্যাপক কর্মসূচী। অতি ভোর থেকেই এ সব কর্মসূচীর শুরু। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রিয় নেতাকে মালাভূষিত করা, আলোচনা সভা, বিশেষ প্রার্থনা, মিলাদ মহফিল, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন প্রভৃতি।

এছাড়া আজ সরকারী-বেসরকারী সকল ভবনে উত্তোলিত হবে জাতীয় পতাকা।

কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ও দলের ঢাকা নগর শাখা যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আজ সকাল সাড়ে ছয়টায় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ঢাকা নগর শাখা অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৭টায় শোভাযাত্রাসহকারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গমন এবং মাল্যদান। সারাদিন কোরান পাঠ ও বিকাল পাঁচটায় মিলাদ মহফিল।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বেইলী রোডস্থ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন গাজী গোলাম মোস্তফা। প্রধান অতিথি থাকবেন

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দঃ

বঙ্গবন্ধুর আজ ৫৫তম জন্মবার্ষিকী। প্রিয়তম নেতার জন্মদিনকে পালনের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে এগিয়ে এসেছে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। গ্রহণ করেছে ব্যাপক কর্মসূচী। অতি ভোর থেকেই এ সব কর্মসূচীর শুরু। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রিয় নেতাকে মালাভূষিত করা, আলোচনা সভা, বিশেষ প্রার্থনা, মিলাদ মহফিল, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন প্রভৃতি।

এছাড়া আজ সরকারী-বেসরকারী সকল ভবনে উত্তোলিত হবে জাতীয় পতাকা।

কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ও দলের ঢাকা নগর শাখা যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আজ সকাল সাড়ে চয়টায় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ঢাকা নগর শাখা অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৭টায় শোভাযাত্রাসহকারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গমন এবং মাল্যদান। সারাদিন কোরান পাঠ ও বিকাল পাঁচটায় মিলাদ মহফিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বেইলী রোডস্থ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন গাজী গোলাম মোস্তফা। প্রধান অতিথি থাকবেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জনাব কোরবান আলী। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন পীর হাবিবুর রহমান, জনাব আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস।

এছাড়া মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে জাতির পিতার দীর্ঘায়ু কামনা করে।

শ্রমিক লীগ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক লীগের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সংগঠনের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুকে মাল্যদান, মিলাদ মহফিল ও আলোচনাসভা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি থাকবেন বন্যানিয়ন্ত্রন মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন সব জনাব আবদুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি ও কাজী মোজাম্মেল হক।

যুব লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগ কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচী নিয়েছে। সকাল ৬টায় সংগঠণের কার্যালয় থেকে মিছিলসহকারে যুবলীগ কর্মিগণ বঙ্গবন্ধুকে মাল্যদান ও অভিনন্দন জানাতে যাবেন। বিকেল সাড়ে ৪টায় সংগঠনের কার্যালয়ে জাতির জনকের দীর্ঘায়ু কামনা করে মিরাদ মহফিল ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে জাতির পিতার ৫৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করবে। কর্মসূচী : সকাল সাড়ে আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গনে জমায়েত ও মিছিলসহকারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে মাল্যদান ও অভিনন্দন জ্ঞাপন। সকাল ৯টায় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে উপাচার্য ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনালখ্যের উপর এক মনোজ্ঞ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। বিকাল ৪টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আলোচনা সভা।

বাংলা একাডেমী

বিকেল ৩টায় একাডেমী প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা। সভাপতি: ডঃ নিলীমা ইব্রাহিম।

বাকশাল মহিলা শাখা

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমায়েত হয়ে মিছিলসহকারে বঙ্গবন্ধুকে মাল্যভূষিত করতে তাঁর বাসভবনে যাবেন। সংসদ সদস্যা মিসেস মমতাজ বেগম মা-বোনদের সকাল ৭টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছেন।

বাংলাদেশ বেতার

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৫মত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্র থেকে আজ রাত পোনে ন'টায় বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবনের উপর ভিত্তি করে এক আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। দৈনিক পূর্বদেশ সম্পদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ও বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য জনাব মোস্তফা সারোযার এতে অংশ নেবেন। খবর এনার

শিশু কিশোরদের কর্মসূচী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৫তম জন্মবার্ষিকীতে শিশু, কিশোর সংগঠন-কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, গার্লসগাইডস ও বয়স্কাউটের সহস্রাধিক কিশোরকিশোরী বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাবে। আজ বিকাল ৪টায় গণভবনে শিশু কিশোররা সমবেত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে মাল্যভূষিত করবে ও নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক উপহার দেবে।

ঢাকা রেশনসপ মালিক সমিতি

বিকাল ৫টায় ইসফাটনসথ ঢাকা রেশনসপ মালিক সমিতি কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক মিলাদ মহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।

এছাড়া বহু প্রতিষ্ঠান আজ জাতির জনককে বিপুল ভাবে মাল্যভূষিত করবে। মিলাদ মহফিল ও বিশেষ প্রার্থনায় তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করবে। আলোচনাসভার মাধ্যমে জাতির জনকের সংগ্রামী জীবনালেখ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করবে। এইসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে শেরে বাংলা নগর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ শাখা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, সঙ্গীত একাডেমী, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, ইউনাইটেড বয়েজ ক্লাব, বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি, প্রভাকর সংস্কৃতিক ও ক্রীড়াচক্র, মহিলা সমিতি, প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা প্রবাসী গোপালগঞ্জ মহকুমাবাসী, শাহীন স্কুল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের হোটেল ইন্টারকন্টিনেনটাল শাখা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন, ছাত্র ইউনিয়নের সৌজন্যে সিদ্দিকবাজার অগ্রনী সংসদ।

নারায়ণগঞ্জ

জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে আজ নারায়নগঞ্জ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ কার্যালয়ে কোরানখানি ও মিলাদ মহফিল। চাষাড়া টাউন হল মাঠে বিচিত্রানুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টায়। প্রধান অতিথি জনাব কোরবান আলী।

আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টায় চিত্তরঞ্জন কটন মিলস প্রাঙ্গনে বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রধান অতিথি জনাব জিল্লুর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৮ মার্চ ১৯৭৫

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

ভারতের রাষ্ট্রপতি জনাব ফখরুদ্দীন আলী আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রেরিত এক বার্তায় ভারতীয় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ও সুখ এবং বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীও অনুরূপ এক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তায় বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ ও সফল জীবন কামনা করেন। এ খবর 'বাসস' ও বিপিঅই-র।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মার্চ ১৯৭৫

পিতার আশীর্বাদ প্রার্থনায়

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) জন্মদিনের প্রত্যুষে পুত্র রোগশয্যায় শায়িত পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ কামনা করেন। রোগজর্জর বৃদ্ধের শীর্ণ হাত হইতে ঝরিয়া পড়িল আশীর্বাদ। আবেগাপ্লুত পিতা, পুত্রগর্বে গর্বিত পিতার আশীর্বাদ লইয়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নীচে নামিয়া আসিলেন, সাক্ষাৎ দিলেন দর্শনেচ্ছুদের– যাঁহারা তাহার ৫৫তম জন্মবার্ষিকীতে লইয়া আসিয়াছিলেন শুভেচ্ছার ডালি।

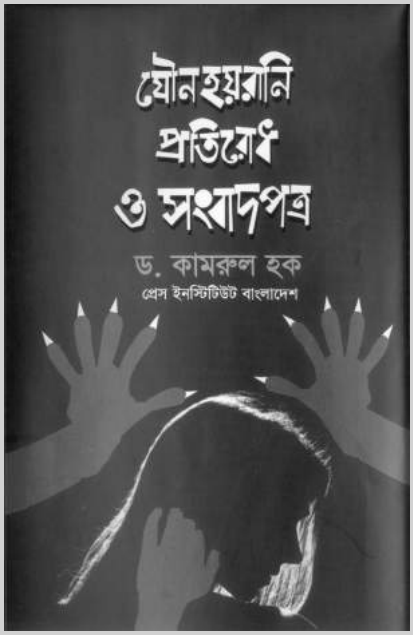

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

জন্ম যদি তব বঙ্গে

জাফর ওয়াজেদ

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে ততদিনে। তার অভিঘাত যদিও আসেনি এই বঙ্গদেশে, তবুও ভারতবর্ষে তখনও আঁধার কেটে আলোর ঝরনা বইছিল না। দখলদার শ্বেতাঙ্গ শাসকরা নিজে আলোকিত হলেও উপমহাদেশজুড়ে অন্ধকারের বাতাবরণ তখন। মানুষ চায় শোষণ, নিপীড়ন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটাতে। কিন্তু শাসকের শক্তিমত্তার কাছে তা অসহায়ত্ব ছাড়া কিছু ছিল না। এমনই পরিবেশ তখন এই অঞ্চলজুড়ে। আর তখন পৃথিবীর মানচিত্রের বিশালত্বের ভেতর টুঙ্গিপাড়া নামক গ্রামটি, পৃথিবীর বিচ্ছিন্নতম গ্রামটিতে একদিন আলোর ফোয়ারা জ্বেলে জেগে উঠেছিল বাংলার প্রাণমন আপ্লুত করে এক মানবশিশুর কান্না-হাসির উতরোল। একটি শতক আগে অর্থাৎ বিংশ শতকের পাদপ্রান্তে তখন মানুষ রণক্লান্ত। মহাযুদ্ধ শেষে পৃথিবীর ঘরে ঘরে তখনও উৎকণ্ঠা। মানবতার অপমান বেজে ওঠে। ফুলের কুঁড়িরাও নিজের ইচ্ছামতো ফুটতে পারে না তখন আর। ঠিক সেসময় আকাশের মতো বিস্তীর্ণ, প্রান্তরের মতো উদার এক শিশু স্পর্শ রাখল বাংলার সবুজ মাটিতে। কালের প্রবাহ ধরে আলোকিত শিশুটিই 'আরও আলো চাই গো' বলে সারাদেশ তোলপাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছিল সূর্যের শিরায় শিরায় বাংলার প্রাণ।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। গোপালগঞ্জের গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় চৈত্রদিনের গান, বসন্তকালের আলো-হাওয়া প্রবাহিত তখন, আর এরই মাঝে আবির্ভূত হলেন বাংলার সহস্র বর্ষের সাধনার নাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাধিত সেই ধন্য পুরুষের জন্মশতবর্ষে বাঙালি জাতি নতুন উদ্দীপনায় তাঁরই নির্দেশিত পথে

মুক্তির রথে চলেছে এগিয়ে। জাতি পালন করছে তার পিতার জন্মশতবর্ষ, মুজিববর্ষ। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি পালিত হয় জাতীয় শিশু-কিশোর দিবস হিসাবে।

তিনি শুধু একটি নাম নন, হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম। ন্যায়, সত্য, কল্যাণ এবং আত্মমুক্তির পক্ষে সোচ্চার উদার হৃদয় মহান মানুষ। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। বাঙালিত্ব ছিল তাঁর অহংকার। এই বাঙালিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতায়। কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছার অনিন্দ্য কুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বাঙালি জাতি। সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। জাতির শানিত শিরায় অকুতোভয় সাহস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দুঃসময়, হতাশার সব বাধার দেওয়াল ভেঙে দীর্ঘ পরাজিত, শোষিত, বঞ্চিত জাতিকে স্বাধীনতার সূর্যস্নানে স্নাত করিয়েছেন। তাই তো প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উচ্চারিত হয় ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় সিক্ত একটি নাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই নাম অবিরাম প্রতি সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে অক্ষয়-অম্লান। চিরদিন বাংলার আকাশে-বাতাসে-মাটিতে শৌর্যে-বীর্যে বহমান নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের প্রিয় নাম হয়ে প্রজ্বলিত যুগ থেকে যুগে। বঙ্গবন্ধু তো শুধু একটি নাম নন, তিনি হলেন একটি জাতির জাগ্রত ইতিহাস। একটি জাতির জন্মদাতা। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা।

তিনি শুধু একটি নাম নন, হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অসমাপ্ত সেই জীবনী। ঘাতকের উদ্যত সঙ্গিন সেই রচনা সমাপ্ত হতে দেয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের দেশি-বিদেশি এজেন্টরা বাঙালিত্বের চেতনা এবং স্বাধীনতার সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর আঘাত হানে। যে শালপ্রাংশু, সিংহহৃদয় মহান মানুষটি অসীম দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি তর্কাতীত ভালোবাসা, অনমনীয় দৃঢ়তা, ভয়-দ্বিধাহীন প্রত্যয় এবং কঠোর অধ্যবসায়কে সম্বল করে ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়েছেন। শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা এবং সর্বোপরি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁকে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট দস্যুর মতো রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অবস্থায় পরিজনসহ হত্যা করা হয়েছিল। এ যে জাতির জন্য কত বড়ো গ্লানি, অপমান ও লজ্জার কথা; তা অবর্ণনীয়। ইতিহাসের চাকা, সভ্যতার চাকাকে নিষ্পেষিত করে ঘাতকরা বাঙালি জাতির জীবনে সৃষ্টি করেছিল ট্র্যাজেডি।

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম যে মহান মানুষটির, তাঁর জীবন ও কর্ম একটি জাতির জীবনকে দিকনির্দেশনা দেয় প্রতিমুহূর্তে। মানুষের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ শেখ মুজিবকে এক মহানপ্রাণ মহামানবে পরিণত করার দিগন্ত উন্মীলিত করেছে। বাঙালি জাতির প্রাণপ্রবাহ এবং ধমনিতে তিনি সাহসের মন্ত্র বুনে দিয়েছেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তিনি। বাংলার অবহেলিত এবং হতভাগ্য জনগণের কল্যাণ কামনায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ততায়। একটি মুহূর্তকেও অপচয় খাতে প্রবাহিত করেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে ছিলেন তিনি একক ভাবে অগ্রসরমান। সবাইকে পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন একটি পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটি সম্পাদনে। একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা–সবকিছুই সম্ভব হয়েছে একক নেতৃত্বে। আর এই যুগান্তকারী কালজয়ী নেতাই হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি যাকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দিয়ে সম্মানিত-সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের। জাতি জানে, এসব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। ছিলেন দূরদর্শী, দুঃসাহসী, আপসহীন। সততা, কর্মনিষ্ঠতা, কর্মকুশলতা–সবকিছু মিলিয়ে এক অতুলনীয় মানবে পরিণত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির জীবনে আপন দ্যুতিতে প্রজ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। সহস্র বছরের সাধনা শেষে বাঙালি জাতি পেয়েছে তার মহানায়ককে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। শেখ মুজিবুর রহমানের পুরো জীবনটাই নিবেদিত তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে জাতির প্রতি যে অপরিসীম ভালোবাসা, তা প্রমাণ করে গেছেন। জীবনের পুরো পথপরিক্রমায় বাঙালির সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকার ছিলেন। নিরন্ন, দুঃখী, অভাবী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জাতির দুর্ভোগমোচনে নিবেদিতপ্রাণ হিসাবে অগ্রসেনানীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দাঙ্গাপীড়িত বাঙালি-অবাঙালিকে রক্ষায় জীবনবাজি রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। লোভ-মোহের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই শাসকের নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে দুঃসাহসে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী হয়েছেন। দিনের পর দিন কেটেছে কারাগারে। লৌহকপাটের অন্তরালে কখনো ভেঙে পড়েননি। হতাশা গ্রাস করেনি। শাসকদের সমঝোতার পথকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারত্ব ইত্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন শেষদিন পর্যন্ত। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সেই সাহসী উচ্চারণ অহেতুক ছিল না। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখা সহজসাধ্য নয়। এই ঘুমন্ত জাতিটিকে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। যে জাতি কখনো বন্দুক-বেয়নেট দেখেনি, সে জাতি একাত্তরে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছে বাঁশের লাঠি, লগি-বৈঠা ফেলে। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' হিসাবে জেনেছেন তিনি। ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের উত্তাপ বঙ্গবন্ধু ধারণ

করতেন। তাই জাতিকে নিজের মতো করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাজার বছর ধরে পরাধীন-পর্যুদস্ত থেকে থেকে যে জাতিটি আধমরা থেকে পুরো মরায় পরিণত হচ্ছিল ক্রমশ; বজ্রহুংকারে শুধু নয়, আদরে-সোহাগে প্রাণের প্রবাহে স্পন্দন তুলে একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। জীবনের পুরো সময়ই থেকেছেন আন্দোলন, সংগ্রামে। তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার। দেশ স্বাধীন করার। দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। লাল-সবুজের পতাকায় বাঙালির মুক্তির জয়গান লিখেছেন। তাঁর জীবন এক বীরত্বগাথা।

শুধু বাঙালি জাতি নয়, বাংলাভাষীসহ অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছেও মুক্তির প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গার সময় ছুটে গিয়েছেন কোনো পক্ষাবলম্বন না করেই। দুপক্ষকেই নিরস্ত্র করতে পেরেছিলেন। অবাঙালিদের বলেছিলেন, তোমরা আমার ভাই। পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমার দেশের মানুষের রক্তে হোলিখেলার চেষ্টা করো না। দেশে বসবাসরত বাংলাভাষী নয়, এমন মানুষকেও তিনি কাছে টেনেছেন। বলেছেন, সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে সবাই যেন যার যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এক হয়ে মিশি। ভুলে যাই যেন ভেদাভেদ। নিজের জীবনেও তিনি এই বিশ্বাসবোধের প্রমাণ রেখেছেন। উর্দুভাষীদের তিনি ঘৃণার চোখে কখনো দেখেননি। বরং তাদেরও বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে বক্তৃতাও করেছিলেন এবং তা বাংলা ভাষায়। বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন উচ্চাসন।

বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবন থেকেই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন। তাই জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত ছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন পাঠ করেছেন। কারাগারের জীবনে এবং পাকিস্তানি কারাগারে একাত্তরের ৯ মাস বন্দিজীবনকালে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু কখনই ধর্মান্ধ ছিলেন না। তাই ইংরেজি ভাষা ছাত্রজীবনেই চর্চা করেছেন। এ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলেই এবং মেধাবী হিসাবে সেসময়ের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। আইন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালেই বহিষ্কৃত হন। অপরাধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সমর্থনদান।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'নেতাজি সুভাষ বোসের' সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থানীয় জনগণের সমস্যা সমাধানের দাবিতে তিনি যখন অগ্রসরমাণ, তখন রাজনৈতিক গণ্ডির পরিধিতে ক্রমশ প্রবিষ্ট হতে থাকেন। গোপালগঞ্জে পড়াকালে যে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হয়েছিল, কলকাতায় তা আরও প্রসারিত হয়। সেখানে ছাত্র আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলে। সাহস ও যোগ্যতায় তিনি সমকালীন অনেককে ডিঙ্গিয়ে পাদপীঠে চলে আসেন। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে মুসলিম লীগ। তখনকার সময়ের রাজনীতিতে শেখ মুজিব তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা শাসনক্ষমতায় সর্বত্র। স্পষ্ট হয় যে, এক ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানি বেনিয়া শোষকদের হাতে পড়েছে বাঙালি। রাষ্ট্রক্ষমতার কোথাও বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি নিজেদের শাসন করার অধিকারটুকুও পাকিস্তানি শাসকরা কবজা করে রেখেছে। উপলব্ধি হলো, পূর্ববঙ্গবাসী দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান–মানুষ এই মৌলিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত। পূর্ববঙ্গের কৃষকের উৎপাদিত পাটসহ অন্যান্য পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে যে আয় হয়, তার পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ব্যয় হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবন আরেক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার উৎসগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষ অনুভব করে যে, পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ বানানো হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহমুক্তি ঘটতে শেখ মুজিবের সময় লাগেনি। তাই মুসলিম লীগবিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন একজন নেতারূপে দেখা দিলেন শেখ মুজিব। গড়ে তুললেন শক্তিশালী বিরোধী দল। বইয়ে দিলেন দেশজুড়ে আন্দোলনের জোয়ার। সেই জোয়ার বাংলার মাঠ, ঘাট, প্রান্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। স্বজাত্যবোধ ক্রমশ তৈরি হতে থাকে গণমানুষের মধ্যে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে মুসলিম লীগ যে পন্থা নিয়েছে, শেখ মুজিবসহ অন্য নেতারা এর বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানকে ধর্মীয় রাষ্ট্র বানানোর নামে শোষণের পথকে আরও সুগম করার পাকিস্তানি মনোভাব ও তৎপরতার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে সোচ্চার ছিলেন শেখ মুজিব। তাঁদের রাজনীতি বরাবরই অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ ছিল। তাঁরা পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেন। সব ধর্মমতের ব্যক্তির রাজনীতিতে ও সংগঠনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করেন। দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে করা হয় আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব ক্রমশ পূর্ববঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব ও সংগঠন সংহত করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বললেন। তিনি উপস্থাপন করলেন ছয় দফা। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসক তার জবাব দিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করে। এতেই আগুনে ঘি পড়ল। পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবকেই একমাত্র স্বার্থরক্ষক হিসাবে দেখলেন। ছাত্ররা ছয় দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে নামে আন্দোলনে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং হলেন বঙ্গবন্ধু। অর্থাৎ বাংলার বন্ধু। এমন যে হতে পারলেন তার কারণ বঙ্গবন্ধুর একাগ্রতা। বিশ্বাস না করে তিনি কোনো কথা বলেননি। যা বলেছেন, তা যথাসাধ্য পালন করেছেন; ভয়ে বা লোভে পড়ে আপস করেননি। ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি গ্রেফতার হননি। আজ যশোর, কাল খুলনা, পরশু রাজশাহী, তার পরদিন সিলেট, তারপরে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামে গ্রেফতার হয়েছেন। জামিন পেতে যে সময়টুকু অপচয় হয়েছে, তারপর আরেক জায়গায় ছুটে গেছেন। আবার গ্রেফতার হওয়া, জামিন পাওয়া, অন্যত্র ছুটে যাওয়া। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরিণাম কী হতে পারত, জানা নেই। তবে এটুকু জানি যে, আইয়ুব খান তাকে শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেমন, একাত্তরে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর জেলখানার পাশে কবর খুঁড়েছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাও করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কিন্তু এসবে ভীত হননি কখনো। কাপুরুষ হননি বলেই পৌরুষোচিত বীরত্ব ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টির বহুচেষ্টা হয়েছিল। মওলানা ভাসানীও ভোটের আগে ভাত চেয়েছিলেন, ব্যালট বাক্সে লাথি মারতে বলেছিলেন। তেইশ বছরে পাকিস্তানে একবারও সাধারণ নির্বাচন হয়নি। এ কথা মনে রাখলে নির্বাচন না চাওয়া

বিস্ময়কর মনে না হয়ে পারে না। নির্বাচন হলো এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। তাঁর সমালোচকরা বলল, এবার তিনি আপস করবেন। কিন্তু আপস হয়নি। সারা পৃথিবী সংগ্রামের এক নতুন রূপ দেখেছিল। সেদিন এ সংগ্রামে সারা দেশের মানুষ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স পঞ্চাশ বছর। তাঁর চেয়ে বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ নেতা অনেক ছিলেন দেশে। মানুষ কিন্তু বঙ্গবন্ধুকেই তাদের নেতা বলে, তাদের স্বার্থের রক্ষক বলে জেনেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্তত মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তাদের দোসর জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তোলা হলেও তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। আলোচনার টেবিলে পাকিস্তানিরা আপসের নানা ফর্মুলা দিলেও বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কোনো আপসে রাজি হননি।

বঙ্গবন্ধু বুঝতেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর বসবাস সম্ভব নয়। জোড়াতালি দিলেও মেলানো যাবে না। সুতরাং, ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক দফা ঘোষণা করলেন এবং তা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। সারাদেশ গর্জে উঠল সেই ডাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে গেল 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি। উঠে এলো 'বাংলাদেশ' নামক একটি নতুন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে পুরো জাতি যে একটি বিন্দুতে এসে স্থির-প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে স্বাধীনতা। পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে ততদিনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পশ্চিমা সংবাদপত্রে বলা হলো 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার কণ্ঠস্বর। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি পুরো জাতিকে তাঁর স্বাধীনতার জন্য করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। এমন পূর্বাভাসও দিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তবে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঙালি নীরবে আক্রমণ মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধু 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তোলার জন্য বলেছিলেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব। পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। সারা বাংলার মানুষ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। গণহত্যার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল শেখ মুজিবের ডাকে। গড়ে উঠল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার। যুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। কিন্তু বাংলার জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর নামে। বঙ্গবন্ধুর প্রভাব এমন সর্বব্যাপী ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করার চেষ্টা যারা করেছিল, তারাও বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নাজুকই ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্ত্রের ব্যবহার নাগরিক সমাজকে বদলে দিয়েছিল। রাজনীতির ধরনটাই পালটে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এবং পরিণামে সবকিছুর মূল্য বেড়ে গেল। দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পাটের চাহিদা কমে গেছে। মানুষের প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ তখন ঘটছিল না। দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাংলাদেশকে ঘিরে। বামপন্থি ও দক্ষিণপন্থিরা আদাজল খেয়ে লাগল। পরস্পরবিরোধী দাবিতে রাজপথ মুখর হতে থাকল। কেউ চায় পাকিস্তানি সেনাদের বিচার, কেউ চায় পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। কেউ চায় ঘাতক-দালালদের বিচার। আবার দালাল আইন প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন করবেন বলে স্বয়ং মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্ত বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী, তা জনগণকে বোঝানো হয়নি। ছাত্রদের একটি অংশ 'গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তারা থানা লুট, ফাঁড়ি লুট, পাট ও খাদ্যের গুদামে আগুন দেওয়াসহ নাশকতামূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। অনেক স্থানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিদের দোসর আলবদর ও রাজাকাররা ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারাও বিদেশ থেকে বাংলাদেশবিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে। নানামুখী ষড়যন্ত্রের মুখে বঙ্গবন্ধু দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র রক্ষায় একটি মহৎ প্রকল্প নেন। তিনি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধেরও ডাক দেন। তাঁর আহ্বান জনগণের কানে পৌঁছলেও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। চোরাগোপ্তা হামলায় প্রাণহানি ঘটছিল, ধ্বংস হচ্ছিল সম্পদ। সর্বহারা পার্টি নামে পাকিস্তানপন্থি দলগুলো এবং তাদের দোসর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছিল। এই অরাজকতা, ধ্বংস, হানাহানির বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। গড়ে তোলেন কৃষক-শ্রমিকের জন্য সংগঠন 'বাকশাল'। একটি জাতীয় ঐক্যের মঞ্চ। বাকশাল নীতিমালা প্রণীতও হয়। কিন্তু কার্যকর করার শুরুর সময় হতেই সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। যারা তাঁকে হত্যা করেছিল, তারা পাকিস্তানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। তাই যে তাজউদ্দীন আহমদ এক বছর আগে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সেই তাঁকেও ঘাতকরা রেহাই দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আরও তিন জাতীয় নেতার সঙ্গে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকেও জেলখানায় হত্যা করেছিল। পাকিস্তান অভিনন্দন জানিয়েছিল 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া পঁচাত্তর সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতা দখল করার পর খুনি মোশতাকের ধারায় দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ নেন। তিনি একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার কাজটি করেন। এরা শাসনক্ষমতায় বসে। এরপর ছড়ি ঘুরাতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে যায়। স্বাধীনতার ইতিহাস, মূলনীতি বিকৃত করা হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলাই শুধু নয়, শেখ মুজিবের নামও মুছে ফেলার চেষ্টা চলে। কিন্তু ইতিহাসের পাতাজুড়ে শেখ মুজিবের নাম জ্বলজ্বল করে। সবকিছু ছাপিয়ে এই একুশ শতকেও আছেন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য দিকনির্দেশনা নিয়ে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতি শেখ মুজিব হত্যার বিচার পেয়েছে। পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। জেলহত্যার বিচারও হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি ছিলেন সৎ। তাঁর সততা ছিল বাঙালির প্রতি, বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি, বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি। সততার মাত্রা তীব্র ছিল বলেই কোনোদিন রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাননি। লড়াই করেছেন সাহসের সঙ্গে। গুলি বঙ্গবন্ধুর বুকেই লেগেছিল, পিঠে নয়। বারবার ফিরে পায় আজও বাঙালি তার জাতির পিতাকে। জন্মশতবর্ষে জাতি নতুনের আহ্বানে গাইছে গান।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে একুশে পদক-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক গুণিজনদের হাতে একুশে পদক তুলে দেন

সাংবাদিকতায় একুশে পদক পেলেন অজয় দাশগুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর একটি বিজাতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভাষার অধিকার এবং স্বাধীনতাসহ সবকিছু বহুমূল্যেই অর্জন করতে হয়েছে আমাদের। ২০ ফেব্রুয়ারি একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মাতৃভাষার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতির পিতা যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, এর মধ্য দিয়েই রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে চলার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের দেশ। এই বাংলাদেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে, সম্মানের সঙ্গে চলবে। কারও কাছে হাত পেতে নয়, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বিশ্বের বুকে চলব।'

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবদীপ্ত অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ২১ বরেণ্য ব্যক্তির হাতে একুশে পদক ২০২১ তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। জাতীয় ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে এবার একুশে পদকের জন্য মনোনীত করা হয়। মরণোত্তর একুশে পদক বিজয়ীদের পক্ষে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই পদক গ্রহণ করেন।

এবার সাংবাদিকতায় একুশে পদক পেয়েছেন অজয় দাশগুপ্ত। ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য মরণোত্তর পদক পেয়েছেন মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার), শামছুল হক, অ্যাডভোকেট আফসার উদ্দীন আহমেদ। শিল্পকলায় পদক পেয়েছেন কণ্ঠশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার, অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ, সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম), আহমেদ ইকবাল হায়দার (নাটক), সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী (চলচ্চিত্র), ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (আবৃত্তি) ও পাভেল রহমান (আলোকচিত্র)। মুক্তিযুদ্ধ ক্যাটাগরিতে গোলাম হাসনায়েন, ফজলুর রহমান খান ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা ইসাবেলা (মরণোত্তর) পদক পেয়েছেন। গবেষণায় অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা। শিক্ষায় বেগম মাহফুজা খানম, অর্থনীতিতে ড. মীর্জা আব্দুল জলিল, সমাজসেবায় প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান, ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কবি কাজী রোজী, বুলবুল চৌধুরী ও গোলাম মুরশিদ পদক পেয়েছেন। পুরস্কার হিসাবে স্বর্ণপদক, সনদপত্র এবং ৪ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়। এবারের ২১ জনসহ এ পর্যন্ত ৫২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১-এ উন্নীত করা হয়।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম পদক বিজয়ীদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন এবং পুরস্কার বিতরণ পর্বটি সঞ্চালনা করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, কবি-সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবীসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের চলচ্চিত্রশিল্প টিকিয়ে রাখতে সম্ভব সবকিছু করার আশ্বাস দিয়ে বিজয়ের ইতিহাস প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অধিক হারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সবাইকে জানাতে হবে। কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী বীরের জাতি। এই বিজয়ের ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন মনে রাখতে পারে, সেই ধরনের চলচ্চিত্র আরও নির্মাণ হওয়া দরকার। একই সঙ্গে শিশুদের জন্য এমনভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে, যাতে তারা সেখান থেকে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা পায়। ১৭ জানুয়ারি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে ২৬টি ক্যাটাগরিতে ৩৩ জন শিল্পী এবং কলাকুশলীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বিজয়ীদের মধ্যে পদক, রেপ্লিকা, সম্মাননার চেক ও সনদ বিতরণ করেন। তারিক আনাম খান (আবার বসন্ত) এবং সুনেরাহ বিনতে কামাল (ন ডরাই) ২০১৯ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া শ্রেষ্ঠ খলচরিত্রের জন্য জাহিদ হাসান (সাপলুডু)এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে তানিম রহমান অংশু (ন ডরাই) পুরস্কার লাভ করেন। যৌথভাবে 'ন ডরাই' ও 'ফাগুন হাওয়ায়' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র মনোনীত হয়। মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা ও কোহিনুর আক্তার সুচন্দা আজীবন সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তথ্যসচিব খাজা মিয়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিজয়ীদের পক্ষে আজীবন সম্মাননা বিজয়ী মাসুদ পারভেজ, সোহেল রানা নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ কলাকুশলী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসসহ গণভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ১৮ জানুয়ারি ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

জাতীয় প্রেস ক্লাবকে ৫০ লাখ টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

করোনাকালীন আর্থিক অনুদান হিসেবে জাতীয় প্রেস ক্লাবকে ৫০ লাখ টাকার চেক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে এই চেক হস্তান্তর করেন

জাতীয় প্রেস ক্লাবকে ৫০ লাখ টাকা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনাকালীন বিশেষ আর্থিক অনুদান হিসাবে এ টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনের কাছে অনুদানের ৫০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম, উপপ্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন, উপপ্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার, সহকারী প্রেস সচিব এমএম ইমরুল কায়েস ও সহকারী প্রেস সচিব মু. আশরাফ সিদ্দিকী বিটু উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, কালের কণ্ঠ

ডিআরইউ-এর আলোচনাসভায় স্পিকার

গত ৫০ বছরে নারীর অর্জন অনেক। তবে সেই অর্জন এসেছে নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে। নারী নিজের যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতা দিয়েই প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখছেন। তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সুযোগ ও সক্ষমতার সমন্বয়ে নারীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। ৯ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) উদ্যোগে নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সভাপতি মুরসালিন নোমানীর সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানু ও দৈনিক আমাদের নতুন সময় সম্পাদক নাসিমা খান মন্টি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডিআরইউ-এর নারীবিষয়ক সম্পাদক রীতা নাহার।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য ডিআরইউ-এর ছয় নারী সদস্যকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন সংগঠনের সাবেক সহসভাপতি মাহমুদা চৌধুরী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সদস্য শাহনাজ বেগম, ইআরএফ সভাপতি শারমিন রিনভী, এটিজেএফবি সভাপতি নাদিরা কিরণ এবং ডিক্যাবের সাবেক সভাপতি আঙ্গুর নাহার মন্টি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথিরা ছয়জনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

এছাড়া ডিআরইউ সদস্যদের বিশেষ সংকলন 'কণ্ঠস্বর'-এর বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথিসহ অন্যরা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবারের কণ্ঠস্বরের বিশেষ সংকলন উৎসর্গ করা হয়েছে শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ-এর সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদ। সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ প্রমুখ।

সূত্র: ১০ মার্চ ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

বিশ্ব বেতার দিবস

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, এ দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে বেতারের ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এবং তথ্যসচিব খাজা মিয়া। বাংলাদেশ বেতারের

মহাপরিচালক আহমেদ কামরুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেন, তথ্য অধিকার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বেতার অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তথ্যসচিব খাজা মিয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থেকে দেশের মানুষের কল্যাণের ব্রত নিয়ে বেতারের কর্মকর্তাদের কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকদের মধ্যে মনোরঞ্জন ঘোষাল, মো. রেজাউল করিম চৌধুরী, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহীন ইসলাম, বাংলাদেশ বেতারের সাবেক মহাপরিচালকদের মধ্যে নেছারউদ্দীন ভূঁইয়া, হোসনে আরা তালুকদার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক সালাহউদ্দীন আহমেদ, ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক কামাল আহমেদ, উপমহাপরিচালক (বার্তা) এসএম জাহীদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

সূত্রঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

সংবাদপত্র শিল্প নিয়ে তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নোয়াবের বৈঠক

সংবাদপত্র শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)-এর নেতারা। করোনা পরিস্থিতিতে নানা সংকট থেকে সংবাদপত্র শিল্পের উত্তরণ নিয়ে নোয়াব নেতারা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন নোয়াবের সভাপতি এ কে আজাদ, সহসভাপতি এএসএম শহীদুল্লাহ খান, নির্বাহী সদস্য মাহফুজ আনাম, নঈম নিজাম ও দেওয়ান হানিফ মাহমুদ এবং সদস্য শাহ হোসাইন ইমাম। নোয়াব নেতারা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে মন্ত্রীর পরামর্শ কামনা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ড. হাছান মাহমুদ জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আরও একবার বিজ্ঞাপনের পাওনা পরিশোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে তাগিদ দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

দেশব্যাপী সংবাদপত্রের গুণগতমান, প্রচারসংখ্যা এবং এই শিল্পকে টেকসই রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয় বৈঠকে।

সূত্রঃ ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, সমকাল

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন সম্পাদক ইলিয়াস খান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ২০২১-২২ মেয়াদে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ফরিদা ইয়াসমিন। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ইতিহাসে এই প্রথম

কোনো নারী সাংবাদিক সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি বিদায়ি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ইলিয়াস খান। ৩১ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ শেষে রাতে ফল ঘোষণা করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। নির্বাচনে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফোরাম' সভাপতিসহ ১১ পদে জয়ী হয়েছে। আর সাধারণ সম্পাদকসহ ৬টি পদ পেয়েছে বিএনপি-জামায়াতপন্থি প্যানেল। এছাড়া জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি পদে বিএনপি-জামায়াতপন্থি প্যানেলের হাসান হাফিজ, সহসভাপতি পদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফোরামের রেজোয়ানুল হক, যুগ্মসম্পাদক পদে একই ফোরামের মাঈনুল আলম ও মো. আশরাফ আলী এবং কোষাধ্যক্ষ পদে শাহেদ চৌধুরী জয়ী হয়েছেন।

১০টি সদস্য পদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফোরাম থেকে ছয়জন নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন আইয়ুব ভূঁইয়া, রেজানুর রহমান, জাহিদুজ্জামান ফারুক, শাহনাজ সিদ্দিকী, ভানুরঞ্জন চক্রবর্তী ও রহমান মুস্তাফিজ। অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াতপন্থি প্যানেল থেকে নির্বাচিত চারজন সদস্য হলেন কাজী রওনাক হোসেন, শাহনাজ বেগম, সৈয়দ আবদাল আহমদ ও বখতিয়ার রানা।

সূত্রঃ ১ জানুয়ারি ২০২১, প্রথম আলো

ডিকাবের সভাপতি পান্থ রহমান সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দিন

চ্যানেল আইয়ের পান্থ রহমান ও ইউএনবির একেএম মঈনুদ্দিন ২০২১ সালের জন্য ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের (ডিকাব) যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন শেষে নতুন এই কার্যনির্বাহী কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ডিকাবের ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যরা হচ্ছেন সহসভাপতি মাহফুজ মিশু (যমুনা টিভি), যুগ্মসম্পাদক ইমরুল কায়েস (বাংলাভিশন), কোষাধ্যক্ষ আতিকুর রহমান (জবাবদিহি), দপ্তর সম্পাদক আরিফুজ্জামান মামুন (আমাদের সময়), সদস্য রাহীদ এজাজ (প্রথম আলো), আঙ্গুর নাহার মন্টি (নিউজটোয়েন্টিফোর), নূরুল ইসলাম হাসিব (বাংলাদেশ পোস্ট), রাশেদ মেহেদী (সমকাল) ও এহসান জুয়েল (সময় টিভি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শফিকুল করিম সাবু। নির্বাচন কমিশনার হিসাবে তাঁকে সহায়তা করেন সিনিয়র সাংবাদিক নিজামউদ্দিন আহমেদ ও আনিস আলমগীর।

সূত্রঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

ক্র্যাবের নতুন সভাপতি মিজান সম্পাদক আলাউদ্দিন

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) কার্যনির্বাহী কমিটি-২০২১ এর নির্বাচনে সভাপতি দৈনিক যুগান্তরের মিজান মালিক ও সাধারণ সম্পাদক পদে দৈনিক দেশ রূপান্তরের আলাউদ্দিন আরিফ নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) ভবনে ৯ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পারভেজ খান স্বাক্ষরিত

বিজ্ঞপ্তিতে এ ফল ঘোষণা করা হয়। সহসভাপতি পদে নিত্য গোপাল তুতু, যুগ্ম-সম্পাদক পদে হাসান-উজ-জামান, অর্থ সম্পাদক পদে এমদাদুল হক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শাহরিয়ার আরিফ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে রুদ্র মিজান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইফ বাবলু নির্বাচিত হয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে এসএম ইসমাঈল হুসাইন ইমু, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদে সাজ্জাদ মাহমুদ খান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে রুদ্র রাসেল এবং কল্যাণ সম্পাদক পদে নাহিদ তন্ময় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এছাড়া কার্যনির্বাহী পদে নির্বাচিত হয়েছেন গোলাম সাত্তার রনি, এসএম মিন্টু হোসেন ও কাজী জামশেদ নাজিম।

সূত্রঃ ১০ জানুয়ারি ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

বিটিভির ৫৫তম বর্ষপূর্তি

দেশের সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভির ৫৫ বছর পূর্তি হয়েছে ২৫ ডিসেম্বর। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান টেলিভিশন নামে চালু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। এরপর বাংলাদেশের জন্মের পরের বছর সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ টেলিভিশন। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু হয় রঙিন সম্প্রচার। এখন বিটিভি ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে দেশের বাইরেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর বিটিভির রামপুরার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিটিভির মহাপরিচালক এসএম হারুন-অর-রশীদ, অনুষ্ঠান ও পরিচালনা পরিচালক জগদীশ এষ, উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) ড. তাসমিনা আহমেদ, উপমহাপরিচালক (বার্তা) অনুপ খাস্তগীর, ঢাকা কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার নাসির মাহমুদসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রযোজকরা।

সংবাদ সম্মেলনে মহাপরিচালক হারুন-অর-রশীদ বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে এসে অন্যান্য টেলিভিশনের মতো আমরাও যুগোপযোগী হতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিটিভিতে সব সময় প্রান্তিক মানুষকে সুযোগ করে দিতে হয়। জনরুচির ইতিবাচক পরিবর্তনকে অনুপ্রেরণা জোগানো হলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের দায়িত্ব।

সূত্রঃ ২৫ ডিসেম্বর ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

৩২ সাংবাদিক পেলেন অ্যামচেম অ্যাওয়ার্ড

বাণিজ্য সংগঠন আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (অ্যামচেম) পক্ষ থেকে 'অ্যামচেম ফ্রন্টলাইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ৩২জন সাংবাদিক। করোনাকালের সাংবাদিকতা এবং অর্থনীতি ও ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

অ্যামচেমের পক্ষ থেকে ২৪ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। অনলাইনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংগঠনটির ভাইস চেয়ারম্যান ও মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন। অ্যামচেম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন।

সূত্রঃ ২৫ জানুয়ারি ২০২১, প্রথম আলো

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজন সম্মাননা দিয়েছে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজনদের সম্মাননা দিয়েছে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা পাওয়া গুণিজন হচ্ছেন ভাষাশহিদ আবদুল জব্বার (মরণোত্তর), ভাষাসংগ্রামী এম শামছুল হক (মরণোত্তর) এবং পিআইবির মহাপরিচালক সাংবাদিক ও কবি জাফর ওয়াজেদ।

একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষাশহিদ আবদুল জব্বারের পক্ষে তাঁর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম বাদল, ভাষাসংগ্রামী এম শামছুল হকের পক্ষে তাঁর ছেলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরিফ আহমেদ এমপি এবং পিআইবি মহাপরিচালক, সাংবাদিক ও কবি জাফর ওয়াজেদ এই সম্মাননা গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনে গৌরবজনক অবদান রাখায় সরকার ২০০০ সালে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের কৃতীসন্তান ভাষাশহিদ আবদুল জব্বারকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে।

ভাষা আন্দোলনে গৌরবজনক ভূমিকা রাখায় ময়মনসিংহের আরেক কৃতীসন্তান ভাষাসংগ্রামী এম শামছুল হককে সরকার চলতি ২০২১ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে।

সাংবাদিকতায় গৌরবজনক ভূমিকা রাখায় সরকার ২০২০ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক সাংবাদিক ও কবি জাফর ওয়াজেদকে একুশে পদকে ভূষিত করে। ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে শনিবার রাতে গুণিজন সম্মাননা প্রদানের এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে ডাকসুর সাবেক নেতা ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান, ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান, ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি ইমাম উদ্দিন মুক্তা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন বক্তব্য দেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজন সাংবাদিক ও কবি জাফর ওয়াজেদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন

শোক সংবাদ

সৈয়দ আবুল মকসুদ

দেশের খ্যাতিমান কলামিস্ট, গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ (৭৪) আর নেই। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের ওপর। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ঋষিজ পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৪৬ সালের ২৩ অক্টোবর মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার এলাচিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সৈয়দ আবুল মাহমুদ ও মা সালেহা বেগম। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬৪ সালে এম আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক নবযুগ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে। 'জনতা'য় কাজ করেন কিছুদিন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) যোগ দেন। ২০০৮ সালের ২ মার্চ বাসসের সম্পাদকীয় বিভাগের চাকরি ছেড়ে দেন। তিনি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। ১৯৮১ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'বিকেলবেলা' প্রকাশিত হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন। আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে নিয়ে তিনি লিখেছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন ও কর্মকাণ্ড, রাজনীতি ও দর্শন (১৯৮৬) ও ভাসানী কাহিনী (২০১৩)। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে নিয়ে লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য (২০১১) ও স্মৃতিতে ওয়ালিউল্লাহ (২০১৪)।

শাহীন রেজা নূর

সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর (৬৬) ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

তিনি অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে ভুগছিলেন। শাহীন রেজা নূরের জন্ম ১৯৫৪ সালে মাগুরায়। তাঁর বাবা শহিদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, মা বেগম নূরজাহান সিরাজ। তিনি ১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি কানাডায় যান। পরে দেশে ফিরে আবার ইত্তেফাকে যোগ দেন। সেখানে তিনি নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেন। শাহীন রেজা নূর প্রজন্ম '৭১-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিচারকাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন।

সৈয়দ লুৎফুল হক

চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক ও লেখক সৈয়দ লুৎফুল হক (৭৩) ২৭ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭ জানুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি হন। জাতীয় প্রেস ক্লাব ও গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। লুৎফুল হকের জন্ম ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। তিনি ১৯৬৮ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি দৈনিক বাংলা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, আনন্দলোকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। সর্বশেষ দি ইনডিপেনডেন্টে ছিলেন। শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর ১০টিসহ ১৪টি বই রয়েছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের এই সদস্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাব লেখক সম্মাননা পেয়েছেন।

মিজানুর রহমান খান

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান খান (৫৪) ১১ জানুয়ারি রাজধানীর মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ১২ জানুয়ারি বাদ আসর রাজধানীর মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা

রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রাঙ্গণে, প্রেস ক্লাব চত্বর এবং কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে পৃথক জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশালের বিএম কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী মিজানুর রহমান খান তিন দশক সাংবাদিকতা করেছেন। সংবিধান, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা, আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু ক্ষুর-ধার কলাম ও নিবন্ধ লিখেছেন তিনি, যেগুলো প্রশংসিত হয়েছে। মিজানুর রহমান খান ১৯৬৬ সালের ৩১ অক্টোবর ঝালকাঠির নলছিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে দৈনিক প্রথম আলো ছাড়াও সমকাল, যুগান্তর, মুক্তকণ্ঠ, বাংলাবাজার, নিউনেশন, সাপ্তাহিক মানচিত্র এবং বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল ও বিপ্লবী বাংলাদেশসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিকতা করেছেন।

হিলালী ওয়াদুদ চৌধুরী

দৈনিক ভোরের কাগজের জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক হিলালী ওয়াদুদ চৌধুরী (৪৮) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৫ জানুয়ারি বুকে ব্যথা অনুভব করলে রাজধানীর মালিবাগের খিদমাহ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ভোরের কাগজ কার্যালয়ের সামনে হিলালী ওয়াদুদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর জলঢাকা উপজেলার ধর্মপাল হাজীপাড়ায় চতুর্থ জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আফজালুর রহমান

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চ্যানেল নাইনের সাবেক প্রতিবেদক আফজালুর রহমান (৩১) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২১ জানুয়ারি শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে মারা যান তিনি। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে

(ডিআরইউ) আফজালের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে নেওয়া হয় টেলিভিশন সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) কার্যালয়ে। এ সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন আফজাল। পাশাপাশি বিজেসির গবেষণা সহযোগী হিসাবেও দায়িত্বরত ছিলেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

মোশাররফ রুমি

সাংবাদিক মোশাররফ রুমি (৫২) মারা গেছেন। ৮ মার্চ রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দ্বিতীয়বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। শাহজাহানপুর আমতলা জামে মসজিদে জানাজা শেষে শাহজাহানপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। সর্বশেষ তিনি দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

মকবুলার রহমান

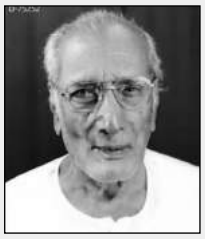

চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মকবুলার রহমান (৯৫) মারা গেছেন। ২১ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। জানাজা শেষে উপজেলার মুন্সীগঞ্জে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। মকবুলার রহমান ১৯৮৫ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পান।

খোন্দকার আতাউল হক

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পাক্ষিক আলোর মিছিল পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খোন্দকার আতাউল হক (৭৩) ২২ ডিসেম্বর রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

আতাউল হক ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতা ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হয়ে কারাভোগ করেন। একাত্তরে নিজ এলাকা ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফরিদপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলকদের অন্যতম। সাংবাদিকতা জীবনে দৈনিক নব অভিযান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য এবং ফরিদপুর জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশনের (এফজেএফডি) উপদেষ্টা ছিলেন তিনি।

আহমদ আখতার

কবি ফররুখ আহমদের ছেলে ও সিনিয়র সাংবাদিক কবি আহমদ আখতার (৬০) ৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেটার লাইফ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি কিডনি ও ডায়াবেটিসজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে তাঁর জানাজা হয়। আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। আহমদ আখতার নয়া দিগন্ত, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাসহ (বাসস) বিভিন্ন গণমাধ্যমে সহসম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮১ সালে দৈনিক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন।

বোরহান উদ্দিন মুজাক্কির

সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন মুজাক্কির (২৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মারা যান। ১৯ ফেব্রুয়ারি আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। নিহত সাংবাদিক উপজেলার চরফকিরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার পত্রিকার কোম্পানীগঞ্জ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি কোম্পানীগঞ্জে সংঘর্ষের সময় বোরহান উদ্দিনসহ আরও তিনজন গুলিবিদ্ধ হন।

এটিএম শামসুজ্জামান

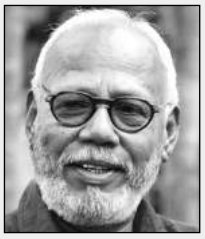

কিংবদন্তি শিল্পী এটিএম শামসুজ্জামান (৮০) ২০ ফেব্রুয়ারি সূত্রাপুরের বাসায় ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘ ছয় দশকের অভিনয় ক্যারিয়ার তাঁর। অভিনয় দিয়ে মানুষের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন এটিএম শামসুজ্জামান। অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসাবে একুশে পদক ও ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন এই অভিনেতা। ১৯৪১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর দৌলতপুরে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এটিএম শামসুজ্জামান। এটিএম শামসুজ্জামানের চলচ্চিত্র জীবনের শুরু ১৯৬১ সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর 'বিষকন্যা' চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসাবে। ১৯৮৭ সালে কাজী হায়াতের 'দায়ী কে' সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান তিনি। ২০১৭ সালে তাঁকে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

আবদুল কাদের

'বদি' খ্যাত অভিনেতা আবদুল কাদের ২৬ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। রাজধানীর সেগুনবাগিচার শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে কাদেরের মরদেহে সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বনানী মসজিদে জানাজা শেষে তাঁর লাশ বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মুজিবুর রহমান দিলু

বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান দিলু (৬৯) ১৯ জানুয়ারি রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন

(ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ঢাকা শিল্পকলা একাডেমিতে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তাঁকে ঢাকা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। বনানী কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আতিকউল্লাহ খান মাসুদ

দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২২ মার্চ ভোরে ক্যান্টনমেন্টস্থ নিজ বাসায় অসুস্থবোধ করলে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। ১৯৯৩ সালে আতিকউল্লাহ খানের প্রকাশনা ও সম্পাদনায় দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত হয়। তিনি গ্লোব-জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারেরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি মসজিদে আতিকউল্লাহ খান মাসুদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর মরদেহ ইস্কাটনে অবস্থিত দৈনিক জনকণ্ঠ কার্যালয়ে নেওয়া হয়। আতিকউল্লাহ খানের জন্ম ১৯৫১ সালের ২৯ আগস্ট মুন্সীগঞ্জের মেদিনী মণ্ডল গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

নুরুল হুদা

প্রবীণ সাংবাদিক নুরুল হুদা (৭৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২১ মার্চ দুপুর ১২টায় ঢাকার মিরপুরে সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন তিনি। নুরুল হুদা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস, কিডনিসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। মিরপুর সাংবাদিক আবাসিক এলাকা জামে মসজিদে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

নুরুল হুদা ১৯৪৯ সালের ১ মার্চ মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের রাঢ়িখালে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু তাঁর। এছাড়া বাসস, ডেইলি স্টার, ডেইলি টেলিগ্রাফ, নিউ নেশন ও ইনডিপেনডেন্টে কর্মরত ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন কূটনৈতিক রিপোর্টার হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাপানের সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন বিদেশি সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করেছেন।

আবু আনাস

ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের ইকোনমিক এডিটর এজেডএম আবু আনাস (৪৫) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৬ মার্চ রাজধানীর পান্থপথে নিজ বাসায় তাঁর মৃত্যু হয়। সাংবাদিকতার জন্য ব্র্যাক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) পুরস্কারসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি। প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণ এবং পান্থপথ জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আনোয়ার উদ্দিন

দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক শীতলক্ষ্যা পত্রিকার সাবেক সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আনোয়ার উদ্দিন মিঞা (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২০ মার্চ নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া বালুর মাঠের ইসলাম হার্ট সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ২১ মার্চ সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল এনায়েতনগর স্কুল মাঠে জানাজা শেষে তাঁর লাশ এনায়েতনগর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ল্যারি কিং

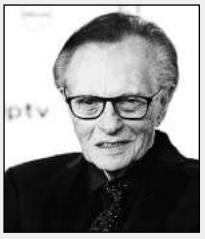

কিংবদন্তি মার্কিন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ল্যারি কিং মারা গেছেন। কয়েক সপ্তাহ করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়ে ২৩ জানুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ল্যারি। ১৯৫০ সালে সাংবাদিক ও ডিজে হিসাবে পেশাজীবন শুরু করেন। সিএনএনে সম্প্রচারিত 'ল্যারি কিং লাইভ' অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্বজুড়ে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেন তিনি।

বিসমুল্লাহ আদেল আইমাক

২ জানুয়ারি আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশে রেডিয়ো সাংবাদিক বিসমুল্লাহ আদেল আইমাককে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা গুলি করে হত্যা করেছে। ২৮ বছর বয়সি আইমাক ভয়েস অব ঘোর রেডিয়োর এডিটর ইন চিফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আফগানিস্তানের সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা দ্য আফগান জার্নালিস্টস সেফটি কমিটি তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

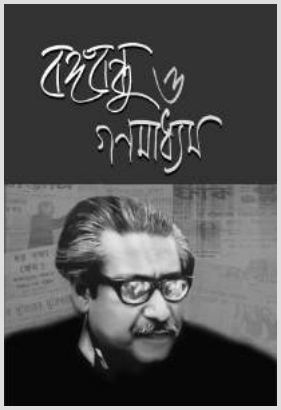

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

পি আই বি সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এ বি তাজুল ইসলাম এমপি

সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে দেশের বিরোধিতা নয়ঃ ক্যাপ্টেন (অব.) তাজুল ইসলাম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। সত্য-মিথ্যা তুলে ধরাই গণমাধ্যমের কাজ। সরকারের ভুলত্রুটিও তুলে ধরা সাংবাদিকদের কাজ। কিন্তু সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে দেশের বিরোধিতা করা ঠিক নয়। ২০ জানুয়ারি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল, আশুগঞ্জ ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৮–২০ জানুয়ারি) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের (আবাসিক) সমাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আমার মতে, নিরপেক্ষ বলতে কোনো কিছু নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার সঙ্গে কোনো আপস নেই। নিরপেক্ষতার নামে যারা এগুলোর সঙ্গে আপস করবে, তারা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। এ সময় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে ১ লাখ টাকা অনুদান দেন ক্যাপ্টেন (অব.) তাজুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ২৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে গাইবান্ধার সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে গাইবান্ধা জেলার উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৩-৫ জানুয়ারি) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আনন্দ আলোর সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রেজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন উপজেলার মোট ২৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ঝালকাঠিতে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে ঝালকাঠি জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৮-২০ জানুয়ারি) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ জানুয়ারি ঝালকাঠি সার্কিট হাউসের সভাকক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. জোহর আলী। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ঝালকাঠি প্রেস ক্লাবের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা চিত্তরঞ্জন সাহা। প্রশিক্ষণে জেলা সদরের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস সিকদার।

কক্সবাজারে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৪-২৬ জানুয়ারি) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি কক্সবাজার প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মো. হারুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিকরা সত্য না লিখলে অপরাধ বেড়ে যাবেঃ সংসদ সদস্য সরওয়ার কমল

তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-৩ (সদর-রামু) আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল বলেছেন, সাংবাদিককে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মানসিকতা ছাড়তে হবে। সত্য না লিখলে সমাজে অপরাধ বেড়ে যাবে। ভীতু মানুষ দয়া করে সাংবাদিকতায় আসবেন না। মেধা দিয়ে কাজ করুন। ২৯ জানুয়ারি কক্সবাজার প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত কক্সবাজার জেলার উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় দুটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের

কক্সবাজার জেলার উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল

চৌধুরী। কক্সবাজার প্রেস ক্লাব ও জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষ পৃথক দুটি ভেন্যুতে একযোগে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণটি দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দুটিতে বিভিন্ন উপজেলার ৭০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

রূপগঞ্জে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৪-৬ জানুয়ারি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ জানুয়ারি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ইন্টারন্যাশনালের উপদেষ্টা লায়ন মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সিদ্ধিরগঞ্জের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১০-১২ জানুয়ারি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১২ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় রওশনারা ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিবিআই নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম পিপিএম, নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শফিউল আলম, রওশনারা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হারুন অর রশিদ, নাসিক প্যানেল মেয়র আফসানা আফরোজ বিভা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সীগঞ্জে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে মুন্সীগঞ্জের ৬টি উপজেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৭ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ সার্কিট হাউসে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি দৈনিক মুন্সীগঞ্জের খবর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক অ্যাডভোকেট সোহানা তাহমিনা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া, টঙ্গীবাড়ি, লৌহজং, সিরাজদীখান, শ্রীনগর ও সদর উপজেলার ৪০জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বরিশালে আঞ্চলিক পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকদের সঙ্গে নিয়ে 'শিশু ও নারী উন্নয়ন' বিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি দুপুরে বরিশাল সার্কিট হাউসের সভাকক্ষে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনি বলেন, সংবাদপত্রে লেখালেখির কারণে এ দেশের অধিকাংশ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ হয়েছে। তবে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে সংবাদপত্রশিল্প বাঁচিয়ে রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে।

জাফর ওয়াজেদ আরও বলেন, পদ্মা সেতু চালু হলে এই অঞ্চলের অনেক কিছু বদলে

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসেবে বক্তব্য রাখছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিকের হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ক গ্রন্থ তুলে দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

যাবে। তবে এখানে যদি কোনো শিল্প-কলকারখানা গড়ে না ওঠে, তাহলে কী করে বদলাবে বরিশাল? অথচ এ ধরনের কোনো লেখালেখি এখানকার কোনো পত্রপত্রিকায় দেখা যায় না, যা দেখে মানুষ এখানে এসে টাকা বিনিয়োগ করবে। বাইরের ব্যবসায়ীরা বরিশালে এসে কেন বিনিয়োগ করবে, এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সংলাপে বরিশালের বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের জন্য চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে কিশোরগঞ্জের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং নিয়ে চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি দুই ধাপে আলাদা ভেন্যুতে এই প্রশিক্ষণ চারটি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলার উপজেলার পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত ৭-৯ ফেব্রুয়ারি 'সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ'- অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। তিনদিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার মোট ৩৫ জন সাংবাদিক অংশ নিয়েছেন। অপর প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউস মিলনায়তনে।

১২ ফেব্রুয়ারি জেলা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় দুটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে সাংবাদিকদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন, কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো. জিল্লুর রহমান।

প্রশিক্ষণ চারটিতে ১৪০জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

হবিগঞ্জের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৯–১১ ফেব্রুয়ারি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) সম্পন্ন হয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট বিভাগ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আজিজুল পারভেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) আফরাজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ২৪জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে মোবাইল সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ৫ ফেব্রুয়ারি তিনদিনব্যাপী (৩–৫ মার্চ) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে পিআইবির

হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক)-এর সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী আবাসিক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এপি'র ব্যুরো প্রধান জুলহাস আলম

প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সিনিয়র সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) সম্পন্ন হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর ঢাকার ব্যুরো প্রধান জুলহাস আলম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুলহাস আলম বলেন, সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকতে হয়। সাংবাদিকতায় নতুন নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে, সেই বিষয়গুলোর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা উচিত। তিনি বলেন, বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মধ্য নিয়ে সাংবাদিকদের পাঠকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, পিআইবি সারাদেশের সাংবাদিকদের মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। বর্তমান সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে পিআইবির চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ময়মনসিংহের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং নিয়ে চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই ধাপে এই চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ এবং উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু। বিশেষ অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. আহমার উজ্জামান। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন জেলা প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান। ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য আরও দুটি সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে দ্বিতীয় ধাপের প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণ চারটিতে ১৪০জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে নড়াইল জেলার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নড়াইল জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি)

নড়াইল জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন তথ্য সচিব খাজা মিয়া

শেরপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সনদ বিতরণ করছেন শেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আতিকুর রহমান আতিক

সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) সম্পন্ন হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) আফরাজুর রহমান। এর আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রশিক্ষণের উদ্‌বোধনও করেন তথ্য সচিব। এ সময় তিনি পিআইবি পরিদর্শন করেন। তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

শেরপুরে পিআইবির তিনটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে শেরপুর জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনটি 'সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি' ও 'অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি শেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই প্রশিক্ষণ তিনটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি) অনুসন্ধ্যানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আতিকুর রহমান আতিক। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন শেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি শরিফুর রহমান। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি শেরপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৯-২১ ফেব্রুয়ারি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২২-২৪ ফেব্রুয়ারি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণেরও উদ্‌বোধন করেন। প্রশিক্ষণ তিনটিতে মোট ১০৫জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে পরিকল্পিত আবাসনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশ-এর সদস্যদের জন্য দুইদিনব্যাপী (২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি) পরিকল্পিত আবাসনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন রিহ্যাবের সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে মোট ৩৫জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

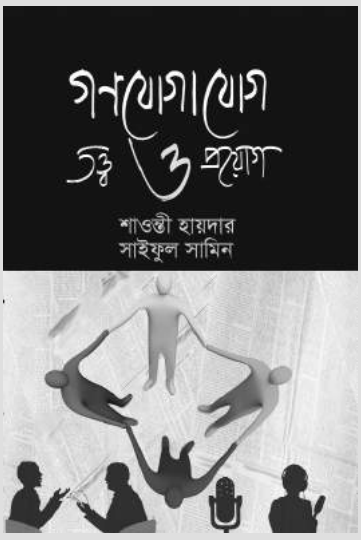

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা